মাতৃকাশক্তি, বাঙালির ভাবজগতে নারী-প্রাধান্যের বলিষ্ঠ উপাদান

রণদীপম বসু

বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের প্রাত্যহিক দ্বন্দ্ব হয়ত ব্যক্তিমাত্রেই গা-সওয়া একটি বিষয়। কিন্তু চিন্তনজগতে ব্যক্তির বিশ্বাসবোধ নাকি অবিশ্বাস তীব্র, সচেতনভাবে তা কি আমরা জানি কেউ? ভাবপ্রবণ জাতি হিসেবে বাঙালির সুনাম-দুর্নাম যা-ই থাক, ভাবুক বা চিন্তক হিসেবে বাঙালির কতটা খ্যাতি রয়েছে তা-ও ভাববার বিষয়। তবে বাঙালির ভাবজগৎ এতটাই বৈচিত্র্যপূর্ণ আর অদ্ভুত বৈপরীত্যের সংমিশ্রণে গড়া যে, সে হয়ত নিজেই জানে না তার আপাত-বিশ্বাস আর প্রকৃত-বিশ্বাসের মধ্যকার পার্থক্যগুলো কী এবং তার উৎসগুলো কোথায় কী অবস্থায় রয়েছে। এই জটিল সমীকরণ সহসাই সমাধান হয়ে যাবে তা ভাবা হয়ত সমীচীন হবে না। তবে জাতি হিসেবে বাঙালির ভাবজগৎ পরিনির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা অপরিহার্য উপাদানগুলো চিহ্নিত করে তার সমূহ পর্যালোচনা করা সম্ভব হলে অনেক উদ্ভূত প্রশ্নেরও যৌক্তিক মীমাংসায় পৌঁছানো অধিকতর সহজ হবে বলে মনে করি।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, বাঙালি একটি ভাষাভিত্তিক ও গোষ্ঠীভিত্তিক জাতি। জাতির বহমান সংস্কৃতি থাকে। বাঙালির ক্ষেত্রে এ ধারাটি অনেক সমৃদ্ধ। কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড একটি রাষ্ট্রের অবিভাজ্য উপাদান হতে পারে, কিন্তু সংগত কারণেই তা জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। ধর্ম কোনো জাতির জাতিসত্তা নির্ধারণের মৌল উপাদান নয়। কারণ ধর্ম সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হতে পারে, কিন্তু জাতিসত্তার নয়। তবে একটি জাতির সাংস্কৃতিক আচার, চিন্তার কাঠামো বা লৌকিক ভাবজগৎ নির্মাণের ক্ষেত্রে তার সংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনা ও উপাচারগুলোর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারায় বাঙালিকে ঐতিহ্যগতভাবে শাক্ত-প্রধান জাতি হিসেবে চিহ্নিত করার ঝোঁকও বহু আগে থেকেই প্রচলিত আছে। তার মানে বাঙালির লৌকিক ভাবজগতে মাতৃকাশক্তি অর্থাৎ যাকে পণ্ডিতজনেরা ভিন্ন নামে শক্তি-সাধনা হিসেবেও চিহ্নিত করেন, তার এবং প্রজননমূলক জাদুবিশ্বাসের প্রভাব সেই আদিকাল থেকেই বিদ্যমান রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এগুলো বাঙালির ভাবজগতে নারী-প্রাধান্যের বলিষ্ঠ উপাদান। এ নিয়ে এখানে খুব দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ নেই হয়ত। তবে বিষয়গুলোর ওপর সংক্ষিপ্ত পরিসরে সামান্য আলোকপাতের চেষ্টা করা যেতে পারে।

মাতৃকাশক্তি : উৎস ও পরম্পরা

আক্ষরিক অর্থে আসলে শক্তিপূজা বলে কিছু নেই। শক্তির উৎস হিসেবে কিছু প্রতীকের উপস্থাপন এবং সেই প্রতীককে বা প্রতীকের মাধ্যমে পূজার প্রচলনই হয়ত শক্তিপূজার প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রাচীন মানুষের মধ্যে এই যে শক্তি ধারণার উন্মেষ তা থেকেই কালে কালে দেবীমূর্তিতে

মাতৃপূজার প্রচলন ঘটা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। কোনো পাথর, পশুপক্ষী, গাছপালা বা বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্নকে 'মাধ্যম' করে উপাসনা, মানত ইত্যাদি লৌকিক জীবনে প্রচলিত অতি সাধারণ উপাচার হিসেবে বাঙালির ভাবজগৎকে এখনো পরিব্যাপ্ত করে আছে। এখানে যতটা না ধর্ম, তার চেয়ে অধিক সত্য হলো লোকায়ত সংস্কৃতির প্রবহমানতা।

লম্বা করে দাঁড় করানো পাথর (যা হয়ত পরবর্তীকালে শিবলিঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে), অন্য কোনো প্রকার পাথর, বিভিন্ন পশুপক্ষী, গাছ-পালা সাংকেতিক চিহ্ন (পরবর্তীকালের তন্ত্রের যন্ত্র) ইত্যাদির মাধ্যমে দেবীপূজার নিদর্শন এখনো অপ্রত্যক্ষ নয়। এসব বস্তুর কোনো একটিকে দেবীজ্ঞানে পূজা করা ছিল মাতৃপূজক গোষ্ঠীর নিয়ম। বর্তমানেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেবীস্থানে বিশেষ আকৃতির প্রস্তরখণ্ড, বিশেষ বৃক্ষ বা বিশেষ পশুতে দেবীপূজার প্রচলন আছে। কালীঘাট বা অন্যান্য দেবীপীঠগুলোতে এখনো বিশেষ প্রস্তরখণ্ডকে দেবী হিসেবে পূজার নিয়ম প্রচলিত আছে। ত্রিকোণাকৃতির প্রস্তরখণ্ডকেও ক্ষেত্রবিশেষে দেবী-যন্ত্র হিসেবে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে পূজা করা হয়। দেবীর বাহনের পূজা প্রকৃতপক্ষে ওই প্রতীক পশুপূজারই রূপান্তর।

এখানে স্মর্তব্য, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষ্যে–

"আদিম মানব-সমাজের সহিত পশু-জগতের যে সম্পর্ক ছিল, বর্তমান সমাজের সেই সম্পর্ক নাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ ও পশু নিত্য প্রতিবেশী ছিল এবং পরস্পর আত্মরক্ষার জন্য সমভাবে সচেষ্ট থাকিত। জাগতিক পরিবর্তনের নিয়মে মানুষ আত্মরক্ষায় দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, অথচ অরণ্যবেষ্টিত বাসভূমির মধ্যে অবস্থান করিয়া পশু-জগতের সান্নিধ্য হইতেও অধিক দূরে সরিয়া আসিতে পারিতেছে না। অতএব নানা দৈব উপায়ে মানুষ হিংস্র পশুকুলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় সন্ধান করিতেছে। তাহারই ফলে সমাজের বিশেষ বিশেষ পশুর অধিষ্ঠাতা এক-একজন দেবতা কল্পনা করিয়া তাঁহার পূজা দ্বারা অত্যাচারী পশুদিগকে প্রসন্ন করিবার প্রয়াস দেখা দিয়াছে। এই ভাবেই মানব-সমাজে পশুপূজার উৎপত্তি হইয়াছে। ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের পূজাও নিঃসন্দেহে পশুপূজার অন্তর্গত।

ভারতীয় প্রাগার্য সমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্যাঘ্রের পূজা প্রচলিত ছিল। মহেঞ্জোদারোতে যে প্রাচীন শিবলিঙ্গ পাওয়া যায়, তাহার পার্শ্বেই ব্যাঘ্রের আকৃতি কতকগুলি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ভারতের প্রাচীন আর্যেতর সমাজের দেবতা শিব বাঘাম্বর বা কৃত্তিবাস এবং ব্যাঘ্রচর্মই তাঁহার আসন। সম্ভবত ব্যাঘ্রই প্রাচীনতম শিবের বাহন ছিল, তারপর সমাজে গো-পূজা আরম্ভ হইলে পর, তাঁহাকে বৃষভ-বাহন করিয়া তাঁহার পরিধেয় বসন ও আসনে ব্যাঘ্রচর্মটি রক্ষা করা হইয়াছে। শিব দেবতার সহিত এই একটি বিশেষ পশুর সংস্রব হইতে ইহাই মনে হয়, প্রাচীনতম সমাজের ব্যাঘ্রোপাসনা শৈব ধর্মের মধ্যে পরবর্তীকালে আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে। উত্তর ভারতের আর্য-সমাজের বহির্ভূত অংশে ব্যাঘ্রপূজা যে বিশেষ প্রচলন লাভ করিয়াছিল, তাহার আরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ...অরণ্যচারী জাতির মধ্যেই ব্যাঘ্রপূজা সবিশেষ প্রচলিত আছে।... পশুপূজার প্রবৃত্তি মূলত নিম্নশ্রেণীর সমাজ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে এবং ইহা উন্নত আর্য দেব-পরিকল্পনার সম্পূর্ণ

বিরোধী। বঙ্গদেশও বহুকালাবধিই অরণ্যাকীর্ণ, বিশেষত বঙ্গদেশের গৌরব সুন্দরবনের প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্র এই দেশের অতি আদিম অধিবাসী। সেইজন্য ব্যাঘ্রপূজা বঙ্গদেশেও বহুকাল হইতেই প্রচলিত ছিল।' (শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৭৪৭-৪৮)

একইভাবে গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষ তথা বাঙলায় অরণ্যচারী জীবজন্তুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভীষণ প্রাণী সর্প ও তার অধিষ্ঠাত্রী মনসা দেবীকে পূজা দিয়ে প্রসন্ন করার কথাও সর্পপূজার উদাহরণ হিসেবে প্রযোজ্য।

পণ্ডিতদের মতে, ভারতে শাক্তধর্মের দু'টি উৎসধারা রয়েছে। একটি বৈদিক আর্যধর্ম থেকে উদ্ভূত পৌরাণিক ধারা, অন্যটি প্রাচীন অনার্য লৌকিক ধারা। এই দুই বিশিষ্ট ধারার মধ্যে যে ধারাটি বৈদিক আর্যধর্ম থেকে উদ্ভূত, প্রকৃতপক্ষে তার কোনো প্রভাব বাঙালির সাধারণ জনসমাজে বিস্তৃতি লাভ করতে পারে নি। বরং বাংলার লৌকিক শক্তিধর্ম বাংলার নিজস্ব জাতীয় উপাদানে গঠিত এমন এক অভিনব অধ্যাত্মবোধ থেকে সৃষ্ট হয়েছে, যার সঙ্গে পৌরাণিক শক্তিবাদ কিংবা হিন্দু বা বৌদ্ধতন্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠী তাদের অনার্য প্রতিবেশীদের সামাজিক জীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে নিজস্ব অধ্যাত্মবোধ দ্বারা যে বিশিষ্ট প্রকৃতির শাক্তধর্মের আদর্শ গড়ে তুলেছিল, তা আর্য আদর্শ থেকে শুধু যে স্বতন্ত্র তা-ই নয়, তা আর্য আদর্শের কিছুটা বিরোধীও বটে। কেননা, আর্যসমাজ শক্তিদেবতার যে পরিকল্পনা করেছিল, তাতে তার সৃষ্টিশক্তির উপরই জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অনার্য-পরিকল্পনায় শক্তিদেবতার ধ্বংসাত্মক গুণের উপরই জোর দেওয়া হয়। কারণ আর্যভাষাভাষীগণ যে শক্তিমান জাতির বংশধর বলে অনুমিত, তারা শক্তির সাধনা দ্বারা চিরকালই ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে বিজয় ও কল্যাণেরই সন্ধান পেয়েছে। তাই তাদের শক্তিদেবতার পরিকল্পনায় দেবতার সৃষ্টি ও কল্যাণ-গুণেরই জয়গান শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় অনার্যদের ইতিহাস স্বতন্ত্র। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অরণ্যচারী অনার্য জাতি হিংস্র বন্যপশু ও অপরিজ্ঞাতরহস্য বিশ্বপ্রকৃতির নিকট থেকে সারাক্ষণ আতঙ্ক ও বিভীষিকাই পেয়ে এসেছে। ফলে সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই তারা আত্মরক্ষায় সচেষ্ট থাকতে গিয়ে অপেক্ষাকৃত শক্তিমান জীব থেকে সর্বদাই দূরে সরে থেকেছে। এই ভয় ও বিস্ময়জনিত তাদের জন্মলব্ধ আদি প্রবৃত্তিগুলোর সাপেক্ষে স্বাভাবিকভাবেই তাদের পরিকল্পনায় তখন দেবতা ছিল অনিষ্টকারী দানব-শক্তিরই প্রতীক মাত্র। আর এ কারণেই এই উভয় আদর্শের মৌলিক বিরোধের মধ্যেই তাদের নিজ নিজ শক্তিদেবতার উদ্ভবের ইতিহাসেও পরস্পর স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষ্যে–

'ভারতীয় শক্তিধর্মের একটি মূলকথা দুর্বলের শক্তিসাধনা– দেবতাকে শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপিণী বলিয়া কল্পনা করিয়া ভক্ত তাঁহার সাযুজ্য দ্বারা নিজের মধ্যে সেই শক্তির উদ্বোধন করিয়া থাকে। কিন্তু নিম্নতর জাতির শক্তিদেবতা বিভীষিকাময়ী মাত্র, তাহার সহিত সাযুজ্যের কল্পনা তো দূরের কথা, তাহার নিকট হইতে আত্মগোপন করিয়া চলাই বরং সমাজের লক্ষ্য। এই আত্মগোপনের প্রবৃত্তি ভয় হইতে জাত, ভক্তি হইতে নহে।'

"বাংলার লৌকিক শাক্তধর্ম এ'দেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের দানবপূজারই পরবর্তী সংস্করণ হইলেও কালক্রমে কতগুলি নূতন বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল। আদিম সমাজের দানবচরিত্রের মত বাংলার লৌকিক শাক্ত দেবচরিত্রসমূহ সমাজ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া পরিকল্পিত হয় নাই। যে সকল আদিম সমাজে দানব-পূজা (Devil-worship) প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে আরাধ্য দানবকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া কদাচ অনুভব করা হয় না। সেইজন্য এই সকল চরিত্রের মধ্যে অতিরিক্ত অতিপ্রাকৃতবাদ (Supernaturalism) আসিয়া পড়ে। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলার লৌকিক দেবচরিত্রসমূহ প্রাগৈতিহাসিক যুগের দানবচরিত্রের উগ্রতা ও অতিপ্রাকৃততা পরিহার করিয়া বহুলাংশে মানবিক বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। পূজা ও পূজকের পার্থক্য এখানে অনেক সময় ঘুচিয়া গিয়াছে। যে প্রকৃতিরই দেবতা হউক, তাহাকে মানুষের স্তরে নামাইয়া লওয়া বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক সাধনার একটি জাতীয় বৈশিষ্ট্য। সেইজন্যই ভয়ঙ্কর বলিয়াও যে সকল দেবতার এখানে কল্পনা করা হয়, তাহারাও সমাজের কোন বাস্তব খল-চরিত্রের উপর ভিত্তি করিয়া পরিকল্পিত হইয়া থাকে। এইজন্যে এই দেবতাদিগকে লইয়া রচিত কাব্যসমূহের মধ্যে বাঙ্গালীরই জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালী জাতিরই একটি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বলিতে হইবে।" (শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস)

বাঙালির লৌকিক ভাব-জগতের মানস-গঠন অনুধাবনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত শাক্ত-বৈশিষ্ট্য অবশ্যই মনোযোগের দাবি রাখে। এ প্রেক্ষিতে 'বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব' গ্রন্থে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

"ধর্মকর্ম ভাবনা ও সংস্কার বর্ণ, শ্রেণী ও কোমভেদে পৃথক; একই কালে একই বিশ্বাস বা একই পূজা ইত্যাদির রূপ সমাজের সকল স্তরে এক নয়, বিভিন্নকালে বিভিন্ন দেশখণ্ডে তো নয়ই। তা ছাড়া, নূতন কোনও বিশ্বাস বা সংস্কার বা পূজানুষ্ঠান ইত্যাদি সমাজে সহসা প্রচার লাভ করে না; তাহার প্রত্যেকটির পশ্চাতে বহুদিনের ধ্যান ও ধারণা, অভ্যাস ও সংস্কার লুকানো থাকে, এবং সমাজের ভিতরে ও বাহিরে নানা গোষ্ঠী, নানা স্তর, নানা কোমের ভক্তি-বিশ্বাস-পূজাচার প্রভৃতির যোগাযোগের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাসও আত্মগোপন করিয়া থাকে; কালে কালে সেই ইতিহাস বিবর্তিত হইয়া সমসাময়িক কালের রূপ গ্রহণ করে মাত্র, এবং তাহাও একান্তই সমসাময়িক সমাজ-ভাবনা ও চেতনানুযায়ী, সমসাময়িক সামাজিক শ্রেণী ও স্তরবিশেষ অনুযায়ী। কোনও শ্রেণীগত বা কোমগত বিশ্বাস বা সংস্কারই আবার একান্তভাবে সেই শ্রেণী বা কোমের মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকে না; অন্যান্য শ্রেণী ও কোম, স্তর ও উপস্তরের সঙ্গে পরস্পর যোগাযোগের ফলে এবং সেই যোগাযোগের শক্তি ও পরিমাণ অনুযায়ী এক শ্রেণী ও কোমের স্তর ও অংশের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, অনুষ্ঠান প্রভৃতি অন্য শ্রেণী ও কোমের স্তর ও অংশে সঞ্চারিত হয়, এবং দ্রুত বা দীর্ঘ মিলন-বিরোধের ভিতর দিয়া অনবরতই নূতন নূতন ধ্যান-ধারণা, ভক্তি-বিশ্বাস অনুষ্ঠান-উপাচার প্রভৃতি সৃষ্টি লাভ করিতে থাকে। যে শ্রেণী বা কোমের আত্মিক ও ব্যবহারিক শক্তি বেশি সেই শ্রেণী বা কোমের ধর্মকর্মগত জীবন অধিকতর সক্রিয়, এবং তাহারা যেমন অন্য শ্রেণী ও কোমের ধর্মকর্মগত জীবনকে বেশি প্রভাবান্বিত করে, তেমনই নিজেরাও সে জীবন দ্বারা বেশি

প্রভাবিত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, দুইই একই সঙ্গে সমান গতিতেই চলে এবং সমন্বয় চলিতে থাকে, স্থূল লোকচক্ষুর আড়ালে একটা জটিল সমন্বয়ের দিকে সমানেই চলিতে থাকে।" (নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, পৃষ্ঠা-৪৭৭)

দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তি নিয়ে এই সমন্বয় প্রক্রিয়া কীভাবে ঘটে থাকে এবং এতদঞ্চলে ঘটেছে তার প্রসঙ্গে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন আরেক জায়গায় বলেছেন–

"ভারতীয় আদিবাসীরা অন্যান্য দেশের অনেক আদিবাসীদের মতো, বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফল, ফুল, পশু, পক্ষী, বিশেষ বিশেষ স্থান ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিত; এখনও খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী, বুনো, শবর ইত্যাদি কোমের লোকেরা তাহাই করিয়া থাকে। বাঙলাদেশে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজের মেয়েদের মধ্যে, বিশেষত পাড়াগাঁয়ে, গাছপূজা এখনো বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে তুলসী গাছ, সেওড়া গাছ ও বট গাছ। অনেক পূজায় ও ব্রতোৎসবে গাছের একটা ডাল আনিয়া পুঁতিয়া দেওয়া হয়, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মস্বীকৃত দেবদেবীর সঙ্গে সেই গাছটিরও পূজা হয়। আমাদের সমস্ত শুভানুষ্ঠানে যে আম্রপল্লবে ঘটের প্রয়োজন হয়, যে কলা-বৌ পূজা হয়, অনেক ব্রতে যে ধানের ছড়ার প্রয়োজন হয়, এ-সমস্তই সেই আদিবাসীদের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের এবং বিশ্বাস ও ধারণার স্মৃতি বহন করে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, এই সব ধারণা, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান আদিম কৃষি ও গ্রামীণ সমাজের গাছ-পাথর পূজা, প্রজনন শক্তির পূজা, পশুপক্ষীর পূজা প্রভৃতির স্মৃতি বহন করে। বিশেষ বিশেষ ফলমূল সম্বন্ধে আমাদের সমাজে যে সব বিধিনিষেধ প্রচলিত, যে সব ফলমূল– যেমন আক, চাল-কুমড়া, কলা ইত্যাদি– আমাদের পূজার্চনায় উৎসর্গ করা হয়, আমাদের মধ্যে যে নবান্ন উৎসব এবং আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান প্রচলিত, আমাদের ঘরের মেয়েরা যে সব ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি করিয়া থাকেন, বস্তুত, আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচার আচারানুষ্ঠানই বাঙলার আদিমতম জন ও কোমদের ধর্মবিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। আমাদের নানা আচারানুষ্ঠানে, ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আজও ধান, ধানের গুচ্ছ, ধানদুর্বার আশীর্বাদ, কলা, হলুদ, সুপারি, পান, নারিকেল, সিন্দুর, কলাগাছ, ঘট, ঘটের উপর আঁকা প্রতীক চিহ্ন, নানা প্রকার আল্পনা, গোবর, কড়ি প্রভৃতি অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। বস্তুত, আমাদের আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে যাহা কিছু শিল্প-সুষমাময় তাহার অনেকখানিই এই আদিবাসীদের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। বাঙলাদেশে, বিশেষভাবে পূর্ব-বাঙলায়, এক বিবাহ-ব্যাপারেই পানখিলি, গাত্রহরিদ্রা, গুটিখেলা, ধান ও কড়ির স্ত্রী আচার, খৈ ছড়ানো, লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপনা, দধিমঙ্গল প্রভৃতি সমস্তই আদিবাসীদের দান বলিয়া অনুমিত। বস্তুত, বিবাহ-ব্যাপারে সম্প্রদান, যজ্ঞ এবং সপ্তপদী অর্থাৎ মন্ত্র অংশ ছাড়া আর সবটাই অবৈদিক, অস্মার্ত ও অব্রাহ্মণ্য। অন্যান্য অনেক ব্যাপারও তাই। পূজার্চনার মধ্যে ঘটলক্ষ্মীর পূজা, ষষ্ঠীপূজা, মনসাপূজা, লিঙ্গ-যোনী পূজা, শ্মশান-শিব ও ভৈরবের পূজা, শ্মশান-কালী পূজা প্রভৃতির প্রায় সব বা অধিকাংশই মূলত এই সব আদিবাসীদের ধর্ম-কর্মানুষ্ঠান হইতেই আমরা গ্রহণ করিয়াছি, অল্পবিস্তর রূপান্তর ও ভাবান্তর ঘটাইয়া।... এবং একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, এই সব আচারানুষ্ঠানের অনেকগুলিই মূলত গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের প্রধানতম ও আদিমতম ভয়-বিস্ময়-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।...

ইঙ্গিতটুকু ধরিয়া না দিলে বাঙালীর ধর্ম-কর্মানুষ্ঠানের গোড়ার কথাটি, তাহার অন্তর্নিহিত অর্থটি বুঝা যাইবে না।" (নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব)

অর্থাৎ, শাক্তধর্মের যে বর্তমান আকার, তার বিকাশ মূলত মধ্যযুগে হলেও তার উৎস আদিম যুগের মাতৃদেবীর উপাসনা এবং তৎকেন্দ্রিক তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান, যেগুলি গড়ে উঠেছিল সুদূরতম অতীত যুগের মানুষদের জীবনচর্যায় নিহিত কয়েকটি মৌল ধারণার অনুষঙ্গের ভিত্তিতে। শক্তি-সাধনা বা শক্তিপূজার উৎস ও পরম্পরা খুঁজতে হলে আমাদেরকে প্রথমত সেগুলোই খোঁজার চেষ্টা করতে হবে।

পাশাপাশি আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, স্পষ্ট একটা ধর্মমতরূপে সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ না করলেও বহুদিন থেকে ভারতবর্ষের অন্যসব অঞ্চলের তুলনায় বাংলা অঞ্চলেই যে শাক্তধর্মের প্রাধান্য ছিল তা অস্বীকার করা চলে না। কেরালা প্রভৃতি দক্ষিণ অঞ্চলে শক্তিপূজার প্রচলন আছে বটে, কিন্তু শাক্তধর্ম সেখানেও সমগ্র জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতিকে এমন করে প্রভাবিত করে নি। তন্ত্রপুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতিকে অবলম্বন করে এই যে শক্তিসাধনা ও মাতৃপূজার সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বিশেষ করে বাংলা অঞ্চলে এত প্রাধান্য ও প্রসার, এই প্রশ্ন স্বভাবতই চিন্তাশীলদের মনে উদয় হয়েছে। এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, বাংলা অঞ্চল মুখ্যভাবে আর্য-অধ্যুষিত দেশ নয়; এ অঞ্চলের সমাজদেহে আর্যরক্তের মিশ্রণ অধিক নয়– এবং এ কারণেই হয়ত এ দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বৈদিক আর্যপ্রভাব সর্বাতিশয়ীরূপে দেখা দেয় নি। এ প্রেক্ষিতে কেউ কেউ মনে করেন যে, বাংলা অঞ্চলের জনসমাজে অনেক প্রাচীনকাল থেকে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্য। সাধারণত ধরা হয়ে থাকে যে, মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনা বৈদিক বা আর্যসংস্কৃতিজাত নয়, ভারতবর্ষের আর্যেতর আদিম জাতিগুলির মধ্য থেকে এই মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনা ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আর্যদের তত্ত্ববুদ্ধির দ্বারা মণ্ডিত হয়ে উচ্চকোটির জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অন্যদিকে ভারতবর্ষের এই আর্যেতর আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে একটা সমাজতাত্ত্বিক সাধারণ ধারণা প্রচলিত হয়ে গেছে যে, সমাজব্যবস্থার দিক থেকে এই আর্যেতর আদিম অধিবাসীরা ছিলেন মাতৃতান্ত্রিক। বৈদিক আর্যরা সমাজব্যবস্থায় পিতৃতান্ত্রিক ছিলেন বলে বৈদিক ধর্মে পুরুষদেবতার প্রাধান্য। ফলে আর্যেতর সমাজের মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্যের জন্য তাদের মধ্যে মাতৃদেবতার এবং মাতৃ-উপাসনার প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। আবার উৎখননপ্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্ন-নিদর্শন অবলম্বন করে নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যেও নানামাত্রিক বিশ্লেষণ রয়েছে। ফলে বিষয়গুলো নিয়ে বিদ্বান-পণ্ডিতদের মধ্যে বিভিন্ন বিতর্কও রয়েছে। তাই এই ধারাগুলো বুঝতে হলে আমাদের ইতিহাসের প্রত্ন-ঐতিহ্য খুঁড়ে খুঁড়েই উৎসমুখের সন্ধানে এগিয়ে যেতে হয়।

এই উৎস-অনুসন্ধানের সুবিধার্থে মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনা প্রসঙ্গে শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তের দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উদ্ধৃত করা হলো–

"মাতৃপূজা এবং শক্তিসাধনার প্রচলন বাঙলাদেশে অনেক পূর্ব হইতে প্রচলিত থাকিলেও খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা এখানে একটা নবরূপ লাভ করিয়াছে এবং এই নবরূপেই বাঙলার সমাজ-সংস্কৃতিকে তাহা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কিন্তু বাঙলাদেশে তন্ত্রসাধনার প্রচলন এবং প্রভাব অনেক পূর্ব হইতে। বাঙলাদেশে এবং তৎসংলগ্ন পূর্বভারতীয় অঞ্চলসমূহে এই তন্ত্রপ্রভাব খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধধর্মের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্মকে বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্মে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছিল। আমার ধারণা, বাঙলাদেশে যত হিন্দুতন্ত্র প্রচলিত আছে তাহা মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত। বাঙলাদেশে এই হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র বলিয়া যে দুইটি জাতিভেদ করা হয় সেই ভেদলক্ষণ আমার কাছে খুব স্পষ্ট এবং নিঃসন্দিগ্ধ মনে হয় না। সংস্কারবর্জিতভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ভারতবর্ষের তন্ত্রসাধনা মূলতঃ একটি সাধনা। তন্ত্রের মধ্যে দার্শনিক মতবাদগুলি বড় কথা নয়– বড় হইল দেহকেই যন্ত্রস্বরূপ করিয়া কতকগুলি গুহ্য সাধনপদ্ধতি। এই সাধনপদ্ধতিগুলি পরবর্তী কালের লোকায়ত বৌদ্ধধর্মের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, আবার হিন্দুধর্মের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া হিন্দুতন্ত্রের রূপ ধারণ করিয়াছে; কিন্তু আসলে বৌদ্ধ 'প্রজ্ঞা-উপায়ে'র পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনাশ্রিত সাধনা, আর হিন্দু শিব-শক্তির পরিকল্পনা এবং তদাশ্রিত সাধনার মধ্যে বিশেষ কোনো মৌলিক পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এই তন্ত্রসাধনার একটি বিশেষ ধারা বৌদ্ধ দোঁহাকোষ এবং চর্যাগীতিগুলির ভিতর দিয়া যে সহজিয়া রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রম-পরিণতি বাংলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে।...

অন্তত দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া বাঙলাদেশে এই একটি তান্ত্রিক ধারা প্রবহণের কারণ কি? এ-বিষয়ে আমার একটি ধারণা আছে– তাহা স্থির সিদ্ধান্ত না হইলেও সুধীগণের বিচারের জন্য উপস্থাপিত করিতেছি। আজকাল আমরা ভারতবর্ষের বহু স্থানে তন্ত্রশাস্ত্র এবং তন্ত্রসাধনার কিছু কিছু উল্লেখ এবং সন্ধান পাইতেছি বটে, কিন্তু তথাপি আমার মনে হয়, বৃহত্তর ভারতে এই তান্ত্রিকতার একটি বিশেষ ভূমিভাগ আছে। উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া নেপাল, তিব্বত, ভূটান, কামরূপ এবং বাঙলাদেশ– হিমালয় পর্বতসংশ্লিষ্ট এই ভূভাগকেই বোধহয় বিশেষভাবে তান্ত্রিক অঞ্চল বলা চলে। হিমালয়সংশ্লিষ্ট এই বিস্তৃত অঞ্চলটিই কি তন্ত্রবর্ণিত 'চীন' দেশ বা মহাচীন? তন্ত্রাচার 'চীনাচার' নামে সুপ্রসিদ্ধ; বশিষ্ঠ চীন বা মহাচীন হইতে এই তন্ত্রাচার লাভ করিয়াছিল, এইরূপ প্রসিদ্ধিও সুপ্রচলিত। এই-সকল কিংবদন্তীও আমাদের অনুমানেরই পরিপোষক বলিয়া মনে হয়। আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, প্রাচীন তন্ত্র অনেকগুলিই কাশ্মীরে রচিত; ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও কিছু কিছু তন্ত্র রচিত হইলেও বঙ্গ-কামরূপ মুখ্যভাবে পরবর্তী তন্ত্রের রচনাস্থান– নেপাল-ভূটান-তিব্বত অঞ্চলে এগুলির বহুল প্রচার এবং অদ্যাবধি সংরক্ষণ। ইহা ব্যতীতও পার্শ্বপ্রমাণরূপে আমরা আরো কতকগুলি তথ্যের উল্লেখ করিতে পারি। তন্ত্রোক্ত দেহস্থ ষট্‌চক্রের পরিকল্পনা সুপ্রসিদ্ধ; নিম্নতম মূলাধার চক্র হইতে আরম্ভ করিয়া ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রকে

লইয়া এই ষট্‌চক্র। এই ছয়টি চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রহিয়াছেন– নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া এই দেবীগণ যথাক্রমে হইলেন ডাকিনী, রাকিণী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী এবং হাকিনী। এই নামগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বেশ বোঝা যায় এই নামগুলি সম্ভবতঃ সংস্কৃত নহে। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই, 'ডাক' কথাটি তিব্বতী, অর্থ জ্ঞানী; ইহারই স্ত্রীলিঙ্গে ডাকিনী। আমাদের 'ডাক ও খনার বচনে'র ডাকের বচন কথার মূল অর্থ বোধহয় জ্ঞানীর বচন। ডাকিনী কথার মূল অর্থ বোধহয় ছিল 'গুহ্যজ্ঞানসম্পন্না'; আমাদের বাঙলা 'ডাইনী' কথার মধ্যে তাহার রেশ আছে; মধ্যযুগের নাথসাহিত্যের রাজা গোপীচাঁদের মাতা ময়নামতী 'মহাজ্ঞান'সম্পন্না এই-জাতীয় 'ডাইনী' ছিলেন। সুতরাং মনে হয়, এই 'ডাকিনী' দেবী কোনো নিগূঢ়জ্ঞানসম্পন্না তিব্বতী দেবী হইবেন। 'লাকিনী' ও 'হাকিনী' নামে ভারতবর্ষের অন্যত্র কোনো দেবীর উল্লেখ পাইতেছি না, কিন্তু ভূটানে 'লাকিনী' ও 'হাকিনী' দেবীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইলে তিব্বত-নেপাল-ভূটান-অঞ্চলের আঞ্চলিক দেবীরাই কি তন্ত্রের ষট্‌চক্রের মধ্যে আপন আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন?

...বাঙলাদেশের শাক্ত-তন্ত্র সম্বন্ধে এই সাধারণ তথ্যের আলোচনা ছাড়িয়া আমরা বাঙলাদেশে প্রচলিত দেবীপূজা বা মাতৃপূজার যে প্রচলিত বিধির রূপ রহিয়াছে তাহাকে ভালভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব আমাদের বর্তমান কালের মাতৃদেবীর মধ্যে বহু যুগের বহু ধারা আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে। অনেক প্রাচীন ধারার মূল আমরা বেদের মধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারি।...

এই মাতৃদেবী বা শক্তিদেবীর প্রাচীন ধারা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, দেবীর প্রাচীন ধারা মুখ্যভাবে দুইটি : একটি হইল শস্যপ্রজননী এবং ভূতধারিণী পৃথিবী দেবীর ধারা, অপরটি হইল এক পর্বতবাসিনী সিংহবাহিনী দেবীর ধারা, যিনি পরবর্তীকালে পার্বতী, গিরিজা, অদ্রিজা বা অদ্রিকুমারী, শৈলতনয়া প্রভৃতি নামে খ্যাতা। এই পার্বতীই হইলেন উমা।" (শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য)

প্রজননমূলক জাদুবিশ্বাস

বিবর্তনের ধারায় মানুষ যেদিন প্রাণময় সত্তা থেকে মনোময় সত্তায় উন্নীত হলো, সেদিন থেকেই পশুর সাথে মানুষের পার্থক্য দেখা দিলো। পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝেছে প্রকৃতিতে সমগ্র জীবজগতের মধ্যে মাত্র দুটোই সত্তা– নারী ও পুরুষ। আর এই দুই সত্তার পারস্পরিক মিলনের মধ্যে দিয়েই সৃষ্টির ধারা বহমান। নিজের জীবনেও সে এই রিপুতাড়নের উদগ্রতা অনুভব করেছে, দেখেছে জীবজগতেও এই সত্য কত সূক্ষ্মভাবে নিঃশব্দে নীরবে কাজ করে চলেছে। হয়ত–

"একইসঙ্গে সে একথাও অনুভব করতে শুরু করেছে যে তার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বিরাজ করছে মূলত দুটো শক্তি, আর এই দুইয়ের উৎসও ওই একই– প্রকৃতি। এর প্রথমটা হলো মাথার উপরে মহাবিচিত্রতায় ভরা সদা পরিবর্তনশীল এক অনন্ত জগৎ, আর দ্বিতীয়টা হলো সে নিজে যার উপর অবস্থান করছে– সেই বসুন্ধরা। এই জগৎও বহু বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ ও অনন্ত জিজ্ঞাসায় ঠাসা।

একই সঙ্গে সে অনুভব করেছে যে, তার মাথার উপরের জগৎটা অনেক বেশি শক্তিমান ও সদা পরিবর্তনশীল। তার পরাভবের কাছে নতজানু হয়ে থাকে ধরিত্রী। এই ধরিত্রীর বুকেই বেড়ে উঠেছে তাবৎ জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জগৎ, যা তাকে খাদ্য, পানীয় ও শিকার জোগায়। পাহাড়ের গুহাগুলো তাকে মায়ের মতো আশ্রয় জোগায় (প্রকৃতির প্রতিকূলতার হাত থেকে)। তখনই এক দার্শনিকতার উদয় হয়– জগৎটা কি তার পরিচিত! (নারী ও পুরুষের) এক মহা মহা বিশাল রূপ! যেখানে সন্তানের মতোই প্রতিপালিত হচ্ছে সে নিজে। সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসের ত্রিগুণাত্মিকা ধরিত্রী হলেন– মাতৃস্বরূপা। আর আকাশ, সে তার পুরুষতাগুণে হলো পুরুষের প্রতীক।" (অশোক রায়, মাতৃকাশক্তি, পৃষ্ঠা-৩৩)

এতদিনে অচেনা জগৎটা বুঝি তার কাছে একটু বোধগম্য হলো। কৃষিভিত্তিক মানবসভ্যতার একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় গোষ্ঠীবদ্ধ যে মানবসমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক, সময়ের বিবর্তনে ক্রমে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো। পুরুষেরা শিকারের সন্ধানে দলবদ্ধভাবে দূর থেকে দূরান্তরে গেলে ঘরে খাদ্যের ভাঁড়ারে টান পড়ত। সন্তানদের ও নিজের খাদ্য-চাহিদা মেটাতে বনের ফল-মধু-ফুল ইত্যাদি সংগ্রহ করেই চলত ক্ষুন্নিবৃত্তি। যখন সেখানেও টান পড়ল, খিদের জ্বালায় নজর পড়ল তৃণভূমিতে, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অবস্থায় গজিয়ে ওঠা শস্যদানার ওপর। তা দিয়েই নিজের ও সন্তানের খিদের জ্বালা মিটত। ক্রমে এই সংগৃহীত শস্যদানা ভিজে মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হলো। এরপর তাদের চিন্তাধারায় এল এক যুগান্তকারী দার্শনিকতা। নিজেদের জীবনে সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়া তো চিরকালই জানা, সেই অভিজ্ঞতাকেই তারা কাজে লাগাল। যেহেতু ভূমি বন্য অবস্থাতেও শস্য উৎপাদন করে, তাই বসুন্ধরাকে মাতৃরূপে কল্পনা করে ভাবতে লাগল– পুরুষ যদি নারীরূপী ক্ষেত্রকে কর্ষণ করে, তবে অবশ্যই সেখানে শস্য উৎপাদিত হবে। তখন তারা পুরুষের প্রতীক স্বরূপ এক লিঙ্গ যষ্টি বানিয়ে ভূমিকর্ষণ করল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমাদের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রে নারীকে 'ক্ষেত্র' বা ভূমি বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। আর পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ 'কর্ষণ যষ্টি' বা 'খনন যষ্টি' আজও অনেক আদিম সমাজে ব্যবহৃত হয় বলে জানা যায়। 'লিঙ্গ', 'লাঙ্গুল' ও 'লাঙ্গল'– এই তিনটে শব্দ যে একই ধাতুরূপ থেকে নিষ্পন্ন তা ড. অতুল সুরের বর্ণনা থেকে জানা যায়।

"প্রৎসিলুসকি (Przyluski) দেখিয়েছেন যে 'লিঙ্গ' ও 'লাঙ্গল' শব্দদ্বয় অস্ট্রিক ভাষার অন্তর্ভুক্ত শব্দ, এবং ব্যুৎপত্তির দিক থেকে উভয় শব্দের অর্থ একই। তিনি বলেছেন যে পুরুষাঙ্গের সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে 'লিঙ্গ' শব্দটি অস্ট্রো-এশিয়াটিক জগতের সর্বত্রই বিদ্যমান, কিন্তু প্রতীচ্যের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহে এর অভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি আরও বলেছেন যে, সংস্কৃত ভাষায় যখন শব্দ দুটি প্রবিষ্ট হলো, তখন একই ধাতুরূপ ('লনগ্') থেকে লাঙ্গুল ও লিঙ্গ শব্দ উদ্ভূত হয়েছিল। অনেক সূত্রগ্রন্থ ও মহাভারত-এ 'লাঙ্গুল' শব্দের মানে লিঙ্গ বা কোনো প্রাণীর লেজ। যদি 'লাঙ্গল=লাঙ্গুল' এই সমীকরণ স্বীকৃত হয়, তা হলে এই তিনটি শব্দের (লাঙ্গল, লাঙ্গুল ও লিঙ্গ) অর্থ-বিবর্তন (semantic evolution) বোঝা কঠিন হবে না। কেননা, সৃষ্টি প্রকল্পে লিঙ্গের ব্যবহার ও শস্য-উৎপাদনে লাঙ্গল দ্বারা ভূমিকর্ষণের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সাদৃশ্য আছে। অস্ট্রিক

ভাষাভাষী অনেক জাতির লোক ভূমিকর্ষণের জন্য লাঙ্গলের পরিবর্তে লিঙ্গ-সদৃশ খনন-যষ্টি ব্যবহার করে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক হিউবার্ট ও. ময়েস বলেছেন যে মেলেনেসিয়া ও পলিনেসিয়ার অনেক জাতি কর্তৃক ব্যবহৃত খনন-যষ্টি লিঙ্গাকারেই নির্মিত হয়। মনে হয়, ভারতের আদিম অধিবাসীরাও নবোপলীয় যুগে বা তার কিছু পূর্বে এইরূপ যষ্টিই ব্যবহার করত, এবং পরে যখন তারা লাঙ্গল উদ্ভাবন করল, তখন তারা একই শব্দের ধাতুরূপ থেকে তার নামকরণ করল।" (অতুল সুর, ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়)

এইভাবে মেয়েরাই প্রথম পৃথিবীর বুকে শস্য উৎপাদন করল এবং ক্রমে পুরুষেরাও কৃষিকর্মে মেয়েদের সহায়ক হলো। ধারণাগতভাবে বিষয়টা যদি যৌক্তিক বিচারে স্বীকারযোগ্য হয় তাহলে মাতৃপূজা ও লিঙ্গপূজার সমন্বিত ভারতীয় শক্তিবাদের তাত্ত্বিক পরিকল্পনার উৎস-বীজটা যে সেই সুপ্রাচীন সিন্ধুযুগের অনার্য সমাজ-উদ্ভূত ধর্মবিশ্বাসেরই বিবর্তিত পরম্পরার স্মারক-চিহ্ন, তা বোধকরি অস্বীকার করা যাবে না।

কৃষিকাজে লিঙ্গরূপী যষ্টি হচ্ছে Passive, আর ভূমিরূপী পৃথিবী ও তাদের মেয়েরা হচ্ছে Active। Active মানেই হচ্ছে শক্তির আধার। কৃষির সাথে প্রজনন প্রক্রিয়ার এই সম্পর্ক বুঝতে পারার পর কৃষির সাফল্যের জন্য ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া কৃষি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে প্রযুক্ত হলো। ফলে নানা ধরনের প্রজননকেন্দ্রিক যৌন অনুষ্ঠানের উদ্ভব হতে থাকে; যেমন, নিউ গিনির আদিম অধিবাসীরা এখনো কৃষির সাফল্যের জন্যে কৃষিভূমিতেই মৈথুন-ক্রিয়ায় রত হয়। এটাকে তারা কৃষি সম্পর্কিত একটা অনুষ্ঠান বলেই মনে করে। একেই বলে উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাস। জেমস ফ্রেজার তাঁর বিখ্যাত 'গোল্ডেন বাউ' গ্রন্থে সারা পৃথিবীর আদিম ও সভ্য সমাজে কৃষিকার্যের বিভিন্ন কৌলিক প্রথার কথা আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি লিখেছেন– জার্মানিতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষিকর্মের আগে নারী রাতের অন্ধকারে নগ্ন অবস্থায় ভূমিতে প্রথম বীজবপন করত। এই প্রথা অন্যত্রও প্রচলিত ছিল, এখনো আছে। আমাদের দেশে সংবৎসর জুড়ে যেসব নানান মেয়েলি ব্রত-অনুষ্ঠানের প্রচলন এখনো গ্রাম-বাংলায় দৃশ্যমান হয়, তার প্রায় সবগুলিই এই উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাসেরই ক্রমবিবর্তিত পরম্পরা। খুব সম্ভবত এই কারণেই ফসল তোলার পর আদিম মানুষের যে প্রথম 'নবান্ন' উৎসব হলো, তা এক যৌন মহোৎসবে পরিণত হলো। আর সেই উৎসবেই জন্ম নিল– লিঙ্গপূজা ও ভূমিরূপী পৃথিবীর পূজা বা যোনি-পূজা। নব-প্রস্তর যুগে এইভাবেই লিঙ্গপূজার সূচনা হয়, যা পরবর্তীকালে দেবাদিদেব ও আদ্যাশক্তিতে (শিব ও শক্তি) পরিণতি লাভ করে। এভাবেই কৃষির সাথে লিঙ্গ ও যোনির সম্পর্ক অতি প্রাচীনকাল থেকে স্থাপিত হয়, যা আজও শিব ও শক্তিরূপে বহমান। একান্ত বাস্তবানুগ পুরুষলিঙ্গ ও যোনি প্রতিরূপ নির্মাণ ও পূজন নব-প্রস্তর যুগেরই অবদান। এ সবই যে কৃষি, উর্বরতা শক্তি, সৃজনশক্তি ও ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে পণ্ডিত মহলে কোনো দ্বিমত নেই।

যেহেতু কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার ও মেয়েদের দ্বারাই বর্ধিত, তাই কৃষিজীবী সমাজজীবনের প্রাথমিক পর্যায়গুলিতে, অন্তত পশুবাহিত লাঙল প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, নারীপ্রাধান্য কিছুটা অবারিত ছিল। ধর্মের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিকভাবেই এর প্রভাব পড়েছে। আদি কৃষিজীবীদের কল্পনায়

জীবনদায়িনী মানবী মাতা ও শস্যদায়িনী পৃথিবী বা বসুমাতা একাকার হয়ে গেছে। মানবিক ও প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতা এই সূত্রে বাঁধা পড়েছে। মাতৃত্বের দেবী শস্যের দেবীতে রূপান্তরিতা হয়েছেন। আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাসের প্রভাব পড়েছে। প্রাকৃতিক ও মানবিক ফলপ্রসূতা একই রহস্যের দুই দিক। মানবিক প্রজননের অনুকরণ তাই প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার পক্ষেও অপরিহার্য মনে হয়েছে। এ কারণেই লিঙ্গ ও যোনি পূজা এবং কামমূলক আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপকতা আদিম কৃষিজীবী সমাজে লক্ষ করা যায়– তান্ত্রিক যৌনাচারসমূহে যেগুলির নিদর্শন আজও টিকে আছে। এগুলির পেছনকার মূল বিশ্বাস– নারী ও প্রকৃতি অভিন্না। নারী ক্ষেত্রস্বরূপা, পুরুষ বীজস্বরূপ, যে কারণে মনু বলেছেন– 'ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্। ক্ষেত্রবীজসমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্বদেহিনাম্॥' (মনুসংহিতা-৯/৩৩) (অর্থাৎ, নারী শস্যক্ষেতের মতো, আর পুরুষ শস্যের বীজস্বরূপ। এই ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগে সকল প্রাণীর উৎপত্তি)। এই দ্বৈতবাদ কালক্রমে ভারতীয় চেতনায় প্রকৃতি ও পুরুষের ধারণায় রূপান্তরিত হয়েছে। নারী ও পুরুষের মিলনে যেভাবে সন্তানের সৃষ্টি হয়, বিশ্বসৃষ্টির মূলেও অনুরূপভাবে প্রকৃতি (Female Principle) এবং পুরুষের (Male Principle) মিলন ক্রিয়াশীল, কিন্তু প্রাধান্য প্রকৃতিরই।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিষয়টিকে দেখতে গেলে প্রতীয়মান হয় যে, আদিম চেতনায় নারী কেবল উৎপাদনেরই প্রতীক ছিল না, সত্যকারের জীবনদায়িনীর ভূমিকাই তার ছিল। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং গুণাবলি ওই জীবনদায়িনী শক্তিরই পরিচায়ক। সামাজিক বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরগুলিতে তাই এই মাতৃত্বেরই ভূমিকা ছিল প্রধান, জীবনদায়িনী মাতৃদেবীই তাই ছিলেন ধর্মের কেন্দ্রবস্তু। উন্নততর কৃষি এবং পশুপালন প্রচলিত হওয়ার পর থেকে, অর্থাৎ সমাজবিকাশের কিছুটা উন্নততর পর্যায়ে, জন্মদানের ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা একটু একটু করে স্বীকৃত হতে শুরু করে। সৃষ্টিতত্ত্বের এই পুরুষ উপাদানটি প্রথম পরিচিত হয় মাতৃদেবীর তাৎপর্যহীন প্রেমিক হিসেবে, কালক্রমে উভয়ের মর্যাদা সমান হয়, এবং অবশেষে পুরুষ উপাদানটিই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে প্রাচীন কৃষিজীবী সমাজ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে, সেখানে এই রূপান্তর খুব দ্রুত হয় নি। আদিম যুগের জীবনদায়িনী মাতার ভূমিকা শস্য ও উদ্ভিদ-জগতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিই মাতৃদেবীরূপে কল্পিতা হয়েছেন। কালক্রমে পিতৃপ্রধান ধর্মের প্রতিষ্ঠা হলেও পুরাতন মাতৃদেবীকে স্থানচ্যুত করা সম্ভবপর হয় নি, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, যেখানকার সমাজজীবন আজও বহুলাংশে কৃষিভিত্তিক।

জাদুবিশ্বাসমূলক যে সকল অনুষ্ঠান ভূমির উর্বরতা বাড়ানোর সঙ্গে সম্পর্কিত, প্রাচীন মানুষের চিন্তায় সেগুলিকে মেয়েদের বিশেষ ব্যাপার বলে গণ্য করা হতো। পৃথিবীর ফলোৎপাদিকা শক্তিকে মেয়েদের সন্তান উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখার রীতি পৃথিবীর সর্বত্রই বিদ্যমান। সংস্পর্শ অথবা অনুকরণের দ্বারা একের প্রভাব অন্যের ওপর সঞ্চারিত করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা হতো। যে সকল পূর্বশর্ত নারীকে ফলপ্রসূ করে, তা পৃথিবীরূপী মাতৃদেবীকে ফলপ্রসূ করে। এই বিশ্বাসগত ধারণাই উর্বরতাকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাসের মৌল ধারণা।

বারো খণ্ডে রচিত অত্যন্ত বিখ্যাত গ্রন্থ The Golden Bough-এর লেখক স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার-এর মতে, জাদুবিশ্বাসের মূল ব্যাপারটা হলো অনুকরণমূলক বা সংস্পর্শমূলক আচার অনুষ্ঠানের মারফত প্রকৃতিকে নিজের ইচ্ছানুবর্তী করা, 'বাস্তবের কল্পনা' দিয়ে 'কল্পনার বাস্তব'কে অধিকার করার লক্ষ্যে স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি ধারণার অনুষঙ্গের নিয়মাবলির প্রয়োগ। প্রাচীন ভারতের একদা বহুল প্রচলিত যজ্ঞ-প্রথার বারো আনা অংশই বস্তুত জাদুবিশ্বাসমূলক বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। তাছাড়া বর্তমান হিন্দু ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলি এখন পর্যন্ত জাদুবিশ্বাসের নিদর্শন বহন করছে। জাদুবিশ্বাসের ক্ষেত্রে দুটি অনুষঙ্গের নিয়ম অনুসরণ করা হয়– সাদৃশ্যমূলক বা অনুকরণমূলক জাদুবিশ্বাস ও সংস্পর্শমূলক জাদুবিশ্বাস। কিন্তু এই অনুষঙ্গের নিয়মগুলি কী? একটু উদাহরণ টানা যাক–

"ধরুন, আমি বৃষ্টি ঘটাতে চাই। যদি আমি বৈজ্ঞানিক হই আমি খুঁজবো বৃষ্টির কারণগুলি কি, এবং চেষ্টা করব সেই কারণগুলির বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়ে বৃষ্টি আনবার। যদি আমি ধর্মে বিশ্বাস করি আমি দেবতার কাছে প্রার্থনা করব, হে ঠাকুর জল দাও। কিন্তু যদি আমি ম্যাজিক মানি, আমি একটি ভাঁড় ফুটো করে তাতে জল ভরে একটি গাছের মাথায় টাঙিয়ে দেব। ওই যে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়বে, আমি বিশ্বাস করব, ওটা বৃষ্টির অনুকরণ, যা করার ফলে বাস্তবে বৃষ্টি হবে। অথবা আমি ড্রাম বাজিয়ে মেঘের ডাকের নকল করব। অথবা আমি দলবল জুটিয়ে বৃষ্টির নাচ নাচব। অথবা আমি ব্যাঙের বিয়ে দেব, কেননা বৃষ্টির আগে ব্যাঙ ডাকে।...

এগুলি হচ্ছে অনুকরণমূলক জাদুবিশ্বাসের উদাহরণ, কৃষিগত অজস্র আচার-অনুষ্ঠানের মূলে যা বর্তমান। এই বিশ্বাসই আদিম মানুষের চোখে নারীর সঙ্গে পৃথিবীর অভিন্নতা এনে দিয়েছে, মানবিক ফলপ্রসূতার ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ করে প্রকৃতির ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা হয়েছে। আরও এক ধরনের জাদুবিশ্বাস আছে যাকে বলা হয় সংস্পর্শমূলক জাদুবিশ্বাস। ধরুন, কোনো স্ত্রীলোক গর্ভবতী হয়েছে, যাতে তার সুপ্রসব হয় সেজন্য আরও পাঁচজন পুত্রবতী মহিলাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হল, যাতে ওই পুত্রবতীদের সংস্পর্শে এসে ওই গর্ভবতী মহিলাটির ভাল হয়। এটি সাধভক্ষণ নামক একটি হিন্দু অনুষ্ঠান। ধরুন আমি শত্রুকে হত্যা করব। তার কুশপুত্তলিকা দাহ করলাম। এটি হল অনুকরণমূলক জাদুবিশ্বাস। তার মাথার একটু চুল বা তার পোষাকের একটু অংশ জোগাড় করে পুড়িয়ে দিলাম। এটি হল সংস্পর্শমূলক জাদুবিশ্বাস।" (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস)

আবার, প্রাচীন ধর্মব্যবস্থার মধ্যে জাদুবিশ্বাসমূলক অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব থেকে প্রাথমিকভাবে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছেন। এই জাদুবিশ্বাসগুলি পর্যালোচনা করে প্রাথমিকভাবে তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, জাদুবিশ্বাস একটা ভ্রান্ত পন্থা, যার প্রয়োগটাই অপপ্রয়োগ, যার তুলনায় ধর্ম একটা উন্নততর মানসিকতার পরিচায়ক। এরা ধরে নিয়েছেন ম্যাজিক একটা জাল-বিজ্ঞান এবং নিষ্ফল কলা-কৌশল। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

বস্তুত, এই ম্যাজিক বা জাদুবিশ্বাসকে বুঝতে গেলে সুপ্রাচীন প্রাক্-বিভক্ত সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তা বুঝতে হবে। আমাদের ফিরে যেতে হবে আদিম প্রাক্-বিভক্ত সমাজে, যেখানে উৎপাদনের কলা-কৌশল ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের, হাতিয়ার ও উপকরণ ছিল যৎসামান্য। বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে এই ঘাটতির পরিপূরক ছিল ম্যাজিক বা জাদুবিশ্বাস, বাস্তব কলাকৌশলের পরিপূরক কাল্পনিক কলাকৌশল এবং সেই হিসেবে জীবনসংগ্রামের একটি অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। এটুকু না-বুঝলে ওই বিভ্রান্তিটা থেকে যাবে।

জাদুবিশ্বাসের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তা একার নয়, সকলের। সমবেত অনুষ্ঠান ছাড়া জাদু হয় না, অন্তত সেই আদিম যুগে হতো না। এখনো পিছিয়ে থাকা মানবসমাজে জাদুবিশ্বাসের যে সকল নিদর্শন দেখা যায় সকল ক্ষেত্রেই সেগুলি সমবেত অনুষ্ঠান। উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো কাজই সমবেত প্রচেষ্টা ও সমবেত প্রেরণা ভিন্ন সম্ভব ছিল না এবং এই প্রেরণা একমাত্র অভিন্ন জাদুবিশ্বাস থেকেই পাওয়া সম্ভব ছিল। পরবর্তীকালে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে প্রাচীন জাদুবিশ্বাস তার নিজস্ব তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছিল। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে জাদুবিশ্বাসের প্রয়োগপদ্ধতি বদলে যায়, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা সুবিধাভোগী শ্রেণির গুহ্যবিদ্যায় রূপান্তরিত হয়। যে সমবেত জীবনচর্যায় সকলের অধিকার ছিল, তা একটি পেশাদার শ্রেণির হাতে চলে যায়। পেশাদার জাদুকরেরাই পুরোহিত শ্রেণির পূর্বসূরী। বৈদিক সাহিত্যের দিকে তাকালেই দেখা যাবে আদিতে যজমানরাই ছিল যজ্ঞের পুরোহিত, কিন্তু পরবর্তীকালে যজ্ঞকার্য তাদের হাতে থাকে নি, তা চলে গেছে পেশাদার পুরোহিত শ্রেণির হাতে।

প্রাক্-বিভক্ত সমাজব্যবস্থা লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্যত প্রকৃতির ওপর প্রভুত্বকারী জাদুবিশ্বাসের মৃত্যু ঘটে এবং তার জায়গায় গড়ে ওঠে দেবতাতন্ত্র, শ্রেণিসমাজের প্রতিভূদের মতোই যাঁদের সেবা ও পূজা করতে হয়, তাঁরা অনুগ্রহ করে কিছু দিলেও দিতে পারেন, না দিলেও পূজা ঠিকমতো পাওয়া চাই। একটি বিশেষ ধরনের সামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে জাদুবিশ্বাস তার নিজস্ব তাৎপর্য হারিয়ে ফেললেও, জনজীবন থেকে তা একেবারে মুছে যায় নি, বিভিন্ন ধর্ম ব্যবস্থার মধ্যে তার অস্তিত্ব আজও খুঁজে পাওয়া যায়; যদিও তার তাৎপর্য সম্পূর্ণ বিপরীতে পর্যবসিত হয়েছে।

"...যে সকল পূর্ব শর্ত নারীকে ফলপ্রসূ করে তা পৃথিবীরূপী মাতৃদেবীকে ফলপ্রসূ করে। এই ধারণা দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় কেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মাতৃদেবীগণ মাঝে মধ্যে রজঃস্বলা হন। (ভারতের ক্ষেত্রে যে সকল দেবীর রজঃস্বলা হবার ঘটনা ও তৎসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান বিশেষ প্রসিদ্ধ তারা হলেন উত্তর ভারতের পার্বতী, কেরলের ভগবতী ও আসামের কামাখ্যা)। প্রকৃতির ফলপ্রসূতাকে আয়ত্তে আনার জন্য প্রাচীন মানুষ নরনারীর জননাঙ্গের ওপর, ওই একই যুক্তিতে, চরম গুরুত্ব আরোপ করেছিল। লিঙ্গ ও যোনি পূজার ব্যাপকতা তারই ফল, মৈথুন কৃষিকর্মের অনুকরণ, পুরুষাঙ্গ ও তার ক্রিয়া যেখানে লাঙ্গল দেবার প্রতীক, নারী-অঙ্গ শস্যোৎপাদিকা ধরিত্রীর সঙ্গে অভিন্ন। লাঙ্গল ও লিঙ্গ একই ধাতুনিষ্পন্ন। তান্ত্রিক যৌনাচারসমূহের আদিম তাৎপর্য এখানেই নিহিত।" (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস)

অনেক কিছুই প্রাচীন জাদুবিশ্বাসে উর্বরতার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়। প্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে রক্তবর্ণ উর্বরতার প্রতীক। রক্তরঙের প্রতীকটিকে প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতি ও সমাজে তাৎপর্যময়রূপে উর্বরাশক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় বলে নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন। কোথাও ডালিম প্রতীকে, কোথাও সিঁদুর প্রতীকে, কোথাও বা অন্যকিছু।

কৃষিকাজ যেহেতু মেয়েদের আবিষ্কার, কৃষিকেন্দ্রিক প্রাচীন অনুষ্ঠান তাই নারীজীবনের নানারকম গোপন ও গভীর রহস্যের সঙ্গে জড়িত। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে রক্ত বর্ণের সঙ্গে নানাদিক থেকে গণেশের নানারকম সম্পর্ক রয়েছে। সিঁদুরের নাম গণেশ-ভূষণ। এই ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে অশোভন ও অসংলগ্ন বলে মনে হয়। কেননা এই সিঁদুর সধবাদেরই সিঁথির ভূষণ। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই সিঁদুরের তাৎপর্যটা কী? এই প্রশ্নের উত্তরেও অধ্যাপক জর্জ টমসন বহু তথ্য পর্যালোচনা করে যে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির নানা মৌলিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে। তাই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তর্জমায় অধ্যাপক টমসনের সুদীর্ঘ উদ্ধৃতিটি উপস্থাপন করা যেতে পারে–

"মানুষের সন্তান-উৎপাদন সংক্রান্ত জাদুবিশ্বাস, ফলাফলের বদলে ফলপ্রসূ পদ্ধতিটির সঙ্গে– সন্তানের বদলে ঋতু ও লোকিয়া-স্রাবের সঙ্গে সংযুক্ত। ফলে ঋতু ও লোকিয়া সমস্ত স্রাবকেই কল্পনা করা হয় নারীর মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রাণদায়িনী শক্তির বিকাশ হিসেবে। আদিম ধ্যানধারণা অনুসারে ঋতুস্রাব সন্তানের জন্মদানের সমতুল্য পদ্ধতি বলেই বিবেচিত। এই জাদুবিশ্বাসের মধ্যে আত্মবিরোধ আছে : রক্তের ওই শক্তিই আবার তাকে ভয়াবহ করে তোলে। একদিক থেকে ঋতুমতী নারী এতো পবিত্র যে, তাকে স্পর্শ করা চলে না। অপর দিক থেকে সে কলুষিত, অস্পৃশ্য। তার অবস্থা হলো, রোমানরা যাকে বলতো sacra– পবিত্র আর ঘৃণিত দুই-ই। ফলে পুরুষপ্রধান সমাজে ধর্মাচরণের উপর মেয়েদের অধিকার লুপ্ত হবার পর এই জাদুবিশ্বাসের নেতিমূলক দিকটিরই জন্ম হয় : ঋতুমতী নারী শুধুমাত্র কলুষিত বলেই বিবেচিত হয়।

এই ধারণাগুলি সার্বভৌম। ঋতুমতী ও প্রসবিনীদের প্রতি মনোভাব-সংক্রান্ত ধারণায় সব দেশের সব মানুষের মধ্যে যতোখানি মিল আছে আর কোনো বিষয়ে তা নেই। ব্রিফল্ট এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং মানবজাতির সমস্ত শাখা ও মানব সংস্কৃতির সমস্ত পর্যায় থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেছেন...

এ্যারিস্টটল, প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিজ্ঞানীদের ধারণায়, ঋতুস্রাব বন্ধ হবার পর গর্ভের মধ্যে ওই ঋতুরজ জমেই সন্তানের দেহগঠন করে। এই রক্তই হলো প্রাণদায়িনী রক্ত। তাই, কোনো মানুষ বা কোনো বস্তুর উপর 'টাবু' ধার্য করবার সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হলো, তার উপর রক্ত-চিহ্ন বা রক্ত-বর্ণ চিহ্ন দেওয়া– ঋতুস্রাব বা লোকিয়া-স্রাব বা তারই কোনো অনুকরণ থেকে এই ব্যবস্থার উৎপত্তি। টাবুটির অন্তর্নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্ব অনুসারেই এই রক্তচিহ্নের দু'রকম তাৎপর্য : চিহ্নিত বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক-নিষেধ এবং প্রাণশক্তির সঞ্চার। সারা পৃথিবীতেই দেখা যায়, ঋতুমতীর অঙ্গে লালমাটির প্রলেপ লাগাবার ব্যবস্থা আছে– তার দরুন পুরুষদের দূরে রাখা ও উর্বরা-শক্তির

বৃদ্ধি দুটো কাজই হবে। অনেক জায়গায় বিবাহানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে স্ত্রীর কপালে রক্ত-বর্ণ চিহ্ন দেবার ব্যবস্থা আছে– এ-চিহ্নের অর্থ, স্বামী ছাড়া অন্যান্য সমস্ত পুরুষের কাছেই মেয়েটি নিষিদ্ধ হলো এবং স্বামীর কাছে সে সন্তানদানের জন্য প্রতিশ্রুত হলো। অঙ্গরাগের উৎস এই থেকেই।

বান্টুদের একটি জাতির মধ্যে দেখা যায়, প্রতিটি মেয়েই একটি করে লালমাটির পাত্র রাখে; পাত্রগুলি মেয়েদের কাছে পবিত্র, অনুষ্ঠানের সময় এর থেকেই তারা মুখ ও অঙ্গ রঞ্জিত করে। নানারকম অনুষ্ঠানেই তাদের কাছে এই পাত্রগুলির প্রয়োজন হয়। তার মধ্যে নিম্নোক্ত অনুষ্ঠানগুলি উল্লেখযোগ্য : আঁতুড়ঘরের পর্ব শেষ হবার সময় প্রসূতা ও সন্তান উভয়কেই এই লালরঙে রঞ্জিত করা হয়– এরই দরুন সন্তানটি বেঁচে থাকবে এবং মা ফিরে আসবে জীবিতদের মধ্যে। 'দীক্ষা'র (initiation) সময় মেয়েটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত রক্তবর্ণে রঞ্জিত করা হয় : এইভাবেই মেয়েটি যেন নতুন জন্ম পেলো এবং এবার থেকে সে ফলবতী হবে। অশৌচাবস্থা শেষ হবার পর বিধবারা অগ্নি স্পর্শ করে এবং তাদের লাল রঙে রঞ্জিত করা হয় : এইভাবেই সে মৃত্যুর ছোঁয়াচ থেকে ফিরে আসে।

রক্তবর্ণ হলো নবজীবন। তার জন্যেই দেখা যায়, প্রাচীন প্রস্তর যুগের উচ্চাবস্থার এবং নব্যপ্রস্তর যুগের কবরখানা থেকে পাওয়া হাড়গুলিতে লাল রঙ মাখানো রয়েছে। প্রতীকটির অর্থ আরো স্পষ্ট হয় যখন দেখি,– এবং প্রায়ই তা দেখতে পাওয়া যায়,– কঙ্কালগুলি গুটোনো ভ্রূণাবস্থার ভঙ্গিতে রয়েছে। মৃতের নবজন্ম সুনিশ্চিত করবার আশায় আদিম মানুষেরা এইভাবে তাকে গর্ভস্থ শিশুর মতো কুঁকড়ে এবং জীবনের রঙে রঞ্জিত করে রাখবার চেয়ে বেশি আর কীই বা করতে পারতো?" (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা ৩৩৮-৯)

টমসনের রচনা থেকে বিশেষ মূল্যবান এই উদ্ধৃতিটুকু আমাদের দেশের নানানরকম আচার-অনুষ্ঠান এবং ধ্যানধারণাকে এইদিক থেকে বুঝবার সুযোগ করে দেয়। আমাদের দেশের সধবারা সিঁথিতে সিঁদুর দেয় এবং সধবাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সিঁদুরের ব্যবহার ভূয়ঃপ্রচলিত। এর পিছনে সেই আদিম বিশ্বাসই লুকোনো আছে– ওই রক্তবর্ণ ঋতুরজের, অতএব নবজন্মের প্রতীক। ফলে এরই স্পর্শে সধবারা সন্তানবতী হবার কামনাকে সফল করতে চায়। রক্ত ও রক্তবর্ণের এই প্রতীক-তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই আদিম বিশ্বাসের দিক থেকেই সিন্ধু-সভ্যতার মাতৃমূর্তিকা প্রভৃতির ব্যাখ্যা অন্বেষণ করেছেন–

"হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর মাতৃ-মূর্তিকাগুলি যে ওই বসুমাতা হিসেবেই পরিকল্পিত হয়েছিল– মার্শাল সর্ব-প্রথম এ-অনুমান করেছিলেন। এবং তাঁর মতে অন্যান্য দেশের বসুমাতার মতোই সিন্ধু-সভ্যতার এই বসুমাতাও প্রকৃতির উর্বরতাদায়িনী বলেই কল্পিত। এই যুক্তি অনুসরণ করেই ম্যাকে মন্তব্য করেছেন, বসুমাতার মূর্তিকা বলেই এগুলি গড়বার উপাদান মৃত্তিকা বা পৃথিবী।...

বসুমাতার মূর্তিকা বলেই এগুলির মূলে সিন্ধু-সভ্যতার ওই বসুমাতার সম্পর্ক চোখে পড়ে। ম্যাকে এ-বিষয়ে নানা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। যেমন মূর্তিকাগুলির সঙ্গে রক্তবর্ণের সম্পর্ক– আদিম বিশ্বাস অনুসারে ওই রক্তবর্ণ উর্বরতার প্রতীক। দক্ষিণ-বেলুচিস্থানে আবিষ্কৃত দেবী-মূর্তিকার অঙ্গে যে কড়ির ভূষণ তারও ব্যাখ্যা একই হওয়া সম্ভব। ম্যাকে বলছেন, মাতৃ-মূর্তিকার অঙ্গে এ জাতীয় কড়ির অলংকারই স্বাভাবিক, কেননা সুপ্রাচীন কাল থেকেই কড়ি উর্বরতার অনুকূল জাদুশক্তি-বিশিষ্ট কল্পিত; মহেঞ্জোদারোর মূর্তিকার অঙ্গেও হয়তো এ-জাতীয় কড়ির অলংকার ছিল, কিন্তু এতদিন মাটিচাপা পড়ে থাকার দরুন আমাদের পক্ষে অলংকারের কড়ি সনাক্ত করা কঠিন।" (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা-৭২)

এ প্রেক্ষিতে মনে হয় উল্লেখ করা বাহুল্য হবে না যে, এখনো হিন্দু সংস্কৃতির সাধারণ জনগোষ্ঠীতে শঙ্খ বা শাঁখার ব্যবহার সধবা নারীদের জন্য অবশ্যম্ভাবী। তা ছাড়া প্রচলিত বিবাহ-অনুষ্ঠানের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাচার হিসেবে নববিবাহিত দম্পতির মধ্যে পাশা-খেলার নামে কড়ি-খেলার যে আকর্ষণীয় প্রচলন পরিলক্ষিত হয়, তা যে আদতে নবদম্পতির মধ্যে প্রজনন-উর্বরতা কামনার সেই আদিম-বিশ্বাসেরই বহিঃপ্রকাশ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠানে কড়ির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আর ভারতীয় অঞ্চলে অর্থনৈতিক বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম হিসেবে আধুনিকতম মুদ্রার প্রচলনও কিন্তু শুরু হয়েছিল কড়ির ব্যবহারের মাধ্যমেই। এর সাথে সুপ্রাচীন সিন্ধু-সংস্কৃতির কোনো যোগসূত্র আছে কি না তা ভাববার বিষয় বৈকি। আর সিঁদুর মানেই তো সধবার প্রতীক, যার কাছে ফলনশীল উর্বরতা কামনা করা হচ্ছে।

অতএব, দেবীপ্রধান সিন্ধু-ধর্মে উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাসের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে দেবী বলতে শাকম্ভরী বা বসুমাতা যে সন্তানদায়িনী জননীর অনুরূপ শস্যদায়িনী পৃথিবী অর্থাৎ, প্রাকৃতিক উর্বরতার কামনাই ওই বসুমাতা-কল্পনার প্রধান উপাদান, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই দ্বিমতের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কাদের ধ্যানধারণায় এ জাতীয় বিশ্বাস গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে? হয়ত এর একটি উত্তরই সম্ভব, প্রাকৃতিক উর্বরতার উপরই যাদের জীবন নির্ভরশীল, পৃথিবীর ফলপ্রসূতাই যাদের সমৃদ্ধির চরম উৎস, অর্থাৎ এক কথায়, যারা কৃষিজীবী। যেহেতু কৃষি-উৎপাদনই ছিল সিন্ধু-সভ্যতার চরম অর্থনৈতিক ভিত্তি, তাই এ সভ্যতায় শস্যদায়িনী পৃথিবীর তথা বসুমাতার বা শাকম্ভরীর উপাসনা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

মূলত এই জাদুবিশ্বাসগুলি হচ্ছে প্রাচীন কৃষিজীবী মানুষের ঐকান্তিক উর্বরতা ও ফল কামনারই বহিঃপ্রকাশ। এবং তার ফলে কৃষিকেন্দ্রিক লোকায়ত অনুষ্ঠানে বীজের বদলে উৎপাদন-ক্ষেত্রেরই প্রাধান্য। এই ক্ষেত্রপ্রাধান্য মূলত মাতৃ-প্রাধান্যেরই পরিচায়ক। এখানে বীজ অপ্রধান। আমাদের দেশে এককালে পিতৃপ্রাধান্য ও মাতৃপ্রাধান্য অর্থে বীজপ্রধান ও ক্ষেত্রপ্রধান শব্দ ব্যবহৃত হতো বলে জানা যায়। যদিও পিতৃপ্রধান আর্যসভ্যতায় বীজের প্রাধান্য ঘোষণা করতে গিয়ে 'মনুসংহিতা'য় বলা হয়েছে–

'ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্।

ক্ষেত্রবীজসমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্বদেহিনাম্'॥ (মনুসংহিতা-৯/৩৩)

'বীজস্য চৈব যোন্যাশ্চ বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে।
সর্বভূতপ্রসূতির্হি বীজলক্ষণলক্ষিতা'॥ (মনুসংহিতা-৯/৩৫)

'যাদৃশং তূপ্যতে বীজং ক্ষেত্রে কালোপপাদিতে।
তাদৃগ্ রোহতি তত্তস্মিন্ বীজং স্বৈর্ব্যঞ্জিতং গুণৈঃ'॥ (মনুসংহিতা-৯/৩৬)

অর্থাৎ, নারী শস্যক্ষেত্রের মতো, আর পুরুষ শস্যের বীজস্বরূপ। এই ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগে সকল প্রাণীর উৎপত্তি (মনু-৯/৩৩)। বীজ এবং যোনি এই দুটির মধ্যে বীজই শ্রেষ্ঠ বলে কথিত হয়। কারণ, সর্বত্র সন্তান বীজের লক্ষণযুক্ত হয়ে থাকে (মনু-৯/৩৫)। বপনের উপযুক্ত বর্ষাকাল প্রভৃতি সময়ে উত্তমরূপে কর্ষণ-সমীকরণ প্রভৃতি পদ্ধতির দ্বারা সংস্কৃত ক্ষেত্রে যেরকম বীজ বপন করা হয়, সেই প্রকার ক্ষেত্রে সেই বীজ বর্ণ-অবয়বসন্নিবেশ রস-বীর্য প্রভৃতি নিজগুণের দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে শস্যরূপে উৎপন্ন হয় (মনু-৯/৩৬)

কিন্তু পিতৃপ্রধান আর্য-আধিপত্যে চাপা পড়েও এতদঞ্চলের প্রাচীন মাতৃপ্রধান কৃষিজীবী মানুষের কামনাগুলি যে সেই প্রাচীন জাদুবিশ্বাসের রেশ নিয়ে এখনো সমাজের লোকায়তিক ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার প্রমাণ বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠান। যার মধ্যে পুরুষ-প্রধান আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব খুব একটা চোখেই পড়ে না। সেখানে কৃষিকেন্দ্রিক মাতৃপ্রাধান্যই স্বীকৃত।

এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, নৃতত্ত্ববিদদের মতে কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক পর্যায়েই এই জাদুবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা মানুষের মনে সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে। তাই–

"রবার্ট ব্রিফল্ট দেখাচ্ছেন, অসভ্য মানুষদের মধ্যে সর্বত্রই দেখা যায় অন্যান্য কাজের তুলনায় কৃষিকাজকে কেন্দ্র করেই জাদুবিশ্বাস এবং জাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরতা সবচেয়ে বেশি। পিউবলো-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে খৃস্টান পাদ্রীরা নানাভাবে খৃস্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেও এই অসভ্য মানুষগুলির মূল বিশ্বাস একটুও টলাতে পারেনি; অথচ এ-বিশ্বাস চুরমার হয়ে যেতে লাগলো যখন ইয়োরোপীয়রা সে-দেশে গিয়ে চাষবাস শুরু করলো। ইয়োরোপীয়দের কৃষিকাজ দেখে ওদের বিশ্বাস এ-ভাবে চুরমার হয়ে যেতে লাগলো কেন? কেননা, ওরা দেখলো কোনোরকম জাদু-অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর না করেই ইয়োরোপীয়রা ফসল ফলাতে পারছে এবং সে-ফসল গুণ বা পরিমাণ কোনো দিক থেকেই নিকৃষ্ট নয়। তাই খৃস্টান পাদ্রীরা হাজার বক্তৃতা দিয়েও তাদের মনের যে-বিশ্বাস টলাতে পারেনি ইয়োরোপীয়দের কৃষিকাজ-পরিদর্শন সে-বিশ্বাসকে উৎপাটিত করতে পারলো। পিউবলো-ইন্ডিয়ানদের এই কাহিনীটি থেকেই অনুমান করা যায়, পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষদের মনে,– এবং অতএব এগিয়ে-আসা মানুষদের পিছনে-ফেলে-আসা পর্যায়েও,– কৃষিকাজ কতো গভীরভাবে জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত এবং জাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল। অবশ্যই ব্রিফল্ট শুধুমাত্র এই দৃষ্টান্তটির উপরই নির্ভর করেননি। আরো বহু তথ্য সংগ্রহ

করে দেখাচ্ছেন, পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের মানুষদের কাছে জাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে কৃষিকাজ একান্তই অসম্ভব।" (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৩৪৩)

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এটি অসম্ভব কেন? এর বাস্তব কারণ ঠিক কী? কৃষি-আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে জাদুবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা এমন ঐকান্তিক কেন? এ প্রেক্ষিতে বাংলার ব্রত সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। তিনি বলেছেন–

"গঙ্গা শুকুশুকু আকাশে ছাই!– সেই সময় বর্ষার জলধারা কল্পনা করে বসুধারা ব্রতের অনুষ্ঠান। এই যে জৈষ্ঠ্যের সারা মাস আষাঢ়ের ছবি মনে জাগিয়ে মানুষ প্রতীক্ষা করছে, এটা বড় কম অবসর নয় আবেগ ঘনীভূত হয়ে নানা শিল্প-ক্রিয়ায় প্রকাশ হবার জন্য। ...এমনি প্রায় প্রত্যেক ব্রতেই দেখি, কামনা অনেকদিন পর্যন্ত– কোথাও একমাস, কোথাও দুমাস– অতৃপ্ত থাকছে চরিতার্থতার পূর্বে। শস্য ফলবার আগেই শস্য উদ্গমের ব্রত আরম্ভ হল এবং শস্যের প্রকৃত উদ্গমের ও কামনার মাঝের দিনগুলো মনের আবেগে নানা কল্পনায় নানা ক্রিয়ায় ভরে উঠে নাট্য, নৃত্য, আলেখ্য, এমনি-সব নানা শিল্পের জন্ম দিতে লাগল।" (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত)

অবনীন্দ্রনাথের কথাগুলি যে আংশিক ঠিক এবং আংশিক ঠিক নয় তা দেখাতে গিয়ে দেবীপ্রসাদ বলছেন–

"কথাগুলি কতোটুকু পর্যন্ত ঠিক? কামনা এবং কামনা-সফল-হওয়ার মাঝখানের যে-দীর্ঘ ব্যবধান তাকেই মনের ঘনীভূত আবেগ দিয়ে,– কামনা সফল হওয়ার ছবি দিয়ে,– ভরিয়ে তোলাই হলো ব্রতের উদ্দেশ্য। নৃত্য, নাট্য, আলেখ্য– এমনি সব নানান উপায়ের উপর নির্ভর করেই মনের ওই ঘনীভূত আবেগকে বাঁচিয়ে রাখবার আয়োজন। অবনীন্দ্রনাথের কথাগুলি ঠিক এবং এই দিক থেকেই ঠিক।

কিন্তু ঠিক নয়ও। ঠিক নয় এই কারণে যে, অর্ধ-অসহায় পর্যায়ের ওই মানুষগুলির কাছে কামনা আর কামনা-সফল-হওয়ার মাঝখানের ওই দীর্ঘ ব্যবধানটি এক চূড়ান্ত পরীক্ষার মতো। আর তাই, এই সময়টি জুড়ে নৃত্য, নাট্য, আলেখ্য এমনি সব নানান শিল্পের সাহায্যে মনের আবেগটুকুকে বাঁচিয়ে রাখবার যে-চেষ্টা তার মূলে রয়েছে জীবন-সংগ্রামের নির্মম চাহিদা, অবসর-বিনোদন নয়– এবং সেই কারণেই অবনীন্দ্রনাথ যখন বলছেন ওই ঘনীভূত আবেগের আসল উপাদান হলো অবসর, তখন তাঁর কথা স্বীকারযোগ্য হতে পারে না।" (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা-৩৪৪)

তবে ব্রতের আদি-তাৎপর্য হিসেবে জীবনসংগ্রামের যে-পটভূমিতে ব্রতের জন্ম তার সঙ্গে জীবনসংগ্রামের আধুনিক পটভূমির যে অনেক তফাৎ তা কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের নিজের রচনাতেই স্বীকৃত হয়েছে। যেমন–

"অনাবৃষ্টির আশঙ্কা আমাদের যদিই বা এখন কোনোদিন চঞ্চল করে তবে হয়তো 'হরি হে রক্ষা করো' বলি মাত্র; কিন্তু ঋতুবিপর্যয়ের মানে যাদের কাছে ছিলো প্রাণ-সংশয়, সেই তখনকার

মানুষেরা কোনো অনির্দিষ্ট দেবতাকে প্রার্থনা কেবল মুখে জানিয়ে তৃপ্ত হতে বা নিশ্চিত হতে পারত না; সে 'বৃষ্টি দাও' বলে ক্ষান্ত হচ্ছে না; সে বৃষ্টি সৃষ্টি করতে, ফসল ফলিয়ে দেখতে চলেছে।... এখনকার মানুষ এ-রকম বিশ্বাস করে না, ব্রতও করে না।

ব্রত হলো মনষ্কামনার স্বরূপটি। আলপনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি; এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাট্যে নৃত্যে; এক কথায়, ব্রতগুলি মানুষের গীত কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন্ত কামনা।...

খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলি ঠিক কোনো দেবতার পুজো নয়; এর মধ্যে ধর্মাচরণ কতক, কতক উৎসব; কতক চিত্রকলা নাট্যকলা গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া। মানুষের ইচ্ছাকে হাতের লেখায় গলার সুরে এবং নাট্য নৃত্যে এমনি নানা চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্মাচরণ করছে, এই হল ব্রতের নিখুঁত চেহারা। অন্তত এই প্রণালীতে সমস্ত প্রাচীন জাতিই ব্রত করছে দেখতে পাই।...

আমাদের একটা ভুল ধারণা ব্রত সম্বন্ধে আছে। আমরা মনে করি যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্ম ও নীতি শেখাতে মেয়েদের জন্যে আধুনিক কিন্ডারগার্টেন প্রণালীর মতো ব্রত-অনুষ্ঠানগুলি আবিষ্কার করে গেছেন। শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি কতকটা তাই বটে, কিন্তু আসল মেয়েলি ব্রত মোটেই তা নয়। এগুলি আমাদের পূর্বপুরুষেরও পূর্বেকার পুরুষদের– তখনকার, যখন শাস্ত্র হয়নি, হিন্দুধর্ম বলে একটা ধর্মও ছিল না এবং যখন ছিল লোকেদের মধ্যে কতকগুলি অনুষ্ঠান, যেগুলির নাম ব্রত।" (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত)

অর্থাৎ বর্তমানে প্রকৃত ব্রত নামে যেগুলির প্রচলন রয়েছে তা আসলে সেই সুপ্রাচীন কৃষিকেন্দ্রিক জীবন-সংগ্রামের অঙ্গ জাদুবিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য প্রভাব। কামনা আর কামনা-সফল-হওয়ার মাঝখানে যে অনিশ্চয়তার ব্যবধান তা সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে কৃষি-বিদ্যার প্রাথমিক পর্যায়েই। তাই এই পর্যায়েই কামনা-সফল-হওয়ার কল্পনা দিয়ে ব্যবধানটিকে ভরাট করে তুলবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। নকলের সাহায্যে কামনা-সফল-হওয়ার কল্পনাকে ফুটিয়ে তোলাই হলো জাদুবিশ্বাসের প্রাণবস্তু।

"ভূমিদেবীর সঙ্গে নারীর সম্পর্ক বৃষ্টির জাদু অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যেও দেখা যায়। ভারতের বহু স্থানে অনাবৃষ্টি হলে মেয়েরা নগ্ন হয়ে বৃষ্টিকে আহ্বান করে। দুজন মেয়ে লাঙ্গলে পশুর ভূমিকায় অভিনয় করে, তৃতীয়জন লাঙ্গল চালায়, এবং এইভাবে লাঙ্গল দেবার একটা অনুকরণ করা হয়। উইলিয়াম ক্রুক ১৮৭৩-এর গোরখপুর দুর্ভিক্ষের সময় এরকম অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন (W. Crooke, *Popular Religion and Folklore in Northern India,* 1896, 69.)। ২৪শে জুলাই ১৮৯২-এ এই রকম একটি ঘটনার বিবরণ চুনার থেকে পাওয়া গিয়েছিল (*North Indian Notes and Queries* I. 210.)। ৩০শে জুলাই ১৯৬৩-তে হুবহু একই অনুষ্ঠান করা হয় লক্ষ্ণৌতে, যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সন্তান উৎপাদনের জন্য নারীর যেমন শুক্রের

প্রয়োজন, ফসলের উৎপাদনের জন্য পৃথিবীরও সেইরকম জলের প্রয়োজন, তাই এই নগ্নতার অনুষ্ঠান।

...রাজস্থানে ভূমি বা শস্যদেবী হিসাবে গৌরীর পূজা করা হয়ে থাকে। এই উপলক্ষ্যে দেবী ও তাঁর স্বামী শিবের দুটি মূর্তি তৈরি করা হয়। পূজার স্থানে একটি ছোট মাটির খাদ তৈরি করা হয় এবং তাতে যব প্রভৃতি বপন করা হয় (J. Tod, *Annals and Antiquities of Rajasthan*, ed. Crook 1920, I. 570 ff.)। দেবতার সামনে এই রকম নকল কৃষিক্ষেত্র তৈরি করার রীতি (বাংলাদেশের ইতুপূজা স্মর্তব্য) পৃথিবীর নানাস্থানে প্রচলিত আছে। ফ্রেজার এই নকল কৃষিক্ষেত্রের নাম দিয়েছেন Garden of Adonis। ওঁরাও ও মুন্ডাদের মধ্যে কৃষির শুরুতে মেয়েরা এরকম নকল কৃষিক্ষেত্র রচনা করে (E. T. Dalton, op. cit. 259.)। দক্ষিণ ভারতে আবার এই জিনিস করা হয় বিবাহসভায় (*Indian Antiquary*, XXV. 144.)। উত্তর-পশ্চিম ভারতের হিমালয়ান্তর্গত জেলাসমূহে শিবপার্বতীর পূজার একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গই হচ্ছে এই আদোনিসের বাগান (E. Atkinson, *Himalayan Districts of the North Western Provinces of India*, 1884, II. 870.)। মহারাষ্ট্রের পান্ধারপুরের বিখ্যাত পদ্মাবতীর মন্দিরে নবরাত্র উৎসবে নকল কৃষিক্ষেত্র রচনা করা হয় (*Bombay Gazetteer*, XX. 454.)। অনুরূপ অনুষ্ঠান শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে উত্তর ভারতের বহু স্থানেই করা হয়।" (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস)

কৃষিমূলক এইসব অনুষ্ঠান ছাড়াও, যৌনধর্মী কিছু কিছু অনুষ্ঠান ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আজও প্রচলিত আছে–

"মণিপুরের নাগাদের মধ্যে বীজবপন ও ফলোদ্গমের সময় একটি উৎসব হয়, যেখানে পুরুষ ও নারীরা অশ্লীল আচরণ করে। তারা মনে করে এগুলি একজাতীয় তুক্ যা ফসলকে রক্ষা করবে (T. C. Hodson, *The Naga Tribes of Manipur*, 1911, 168.)। ছোটনাগপুরের হো উপজাতিরা জানুয়ারী মাসে একটি বিরাট উৎসব করে (এরকম) (E. T. Dalton, op. cit. 196.)।... উড়িষ্যার ভুঁইয়াদের মধ্যে একটি উৎসব আছে যার নাম মাঘ পোরাই, যাতে মদ্যপান ও যৌনমূলক আচরণ অবাধে চলে। এই উৎসব চলে তিন দিন ধরে (Macmillan in *Calcutta Review*, CII. 188.)।... অনুরূপভাবে আসামের বিহু উৎসব (J. Butler, *Travels and Adventures in the Provinces of Assam*, 1885, 226.)।... উইলিয়াম ক্রুক দেখিয়েছেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত হোলি উৎসব আসলে কৃষিমূলক জাদুবিশ্বাসের অভিব্যক্তি (W. Crooke in *Folklore*, XXV. 188.)। এ ছাড়াও এই উৎসবের সঙ্গে প্রাচীন যুগের মৃত্যু ও নবজীবনের ধারণাও সম্পর্কিত, যা ফসলের বার্ষিক জন্ম-মৃত্যুর ধারণারই অভিব্যক্তি ও পরিব্যাপ্তি (N. N. Bhattacharyya, *Ancient Indian Rituals and Their Social Contents*, 1975, 114-129.)। যৌনাচার একদা এই উৎসবের অঙ্গ ছিল, যার নিদর্শন ও অনুকরণ আজও বর্তমান।... কৃষিমূলক যৌন অনুষ্ঠান জয়পুরের পাঞ্জা, নীলগিরির কোটা প্রভৃতি বহু ট্রাইবের

মধ্যেও বর্তমান, শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র।" (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস)

অর্থাৎ, পৃথিবীর ফলোৎপাদিকা শক্তিকে মেয়েদের সন্তান উৎপাদিকা শক্তির সাথে অভিন্ন করে দেখার যে প্রাচীন বিশ্বাস আদিম কৃষিজীবী সমাজে প্রচলিত ছিল, অনুকরণমূলক অনুষ্ঠানের দ্বারা একের প্রভাব অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করা সম্ভব বলে তাঁরা যে বিশ্বাস লালন ও পালন করত সেটাই প্রজননধর্মী জাদুবিশ্বাস। সেই আদিম প্রাক্-বিভক্ত সমাজ এখন বিলুপ্ত হলেও তার জাদুবিশ্বাসের রেশ এখনো শাক্ত-প্রভাবিত সবকটি ধর্মব্যবস্থার অন্তঃস্রোতে বেশ ভালোভাবেই বহমান আছে, হয়ত-বা কোথাও কোথাও নতুন তাৎপর্য নিয়ে। বাংলার প্রচলিত লৌকিক দেবতাদের ক্ষেত্রেও এই বিশ্বাস একইভাবে প্রযোজ্য।

বাংলার লৌকিক দেবতা

বাঙালির ধর্ম-কর্মানুষ্ঠানের গোড়ার কথা বলতে গেলে, তার পেছনে রয়েছে বস্তুত প্রাচীন জনগোষ্ঠীর উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে আদিম প্রজননশক্তির মিশ্রণকল্পনায় সৃষ্ট কিছু লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান মাত্র। আর সেগুলি যে অবশ্যই কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সময়ের প্রবাহে বর্তমানে যান্ত্রিক নগরায়ণের প্রভাবে সেইসব আচার-অনুষ্ঠান ক্রমান্বয়ে লুপ্ত বা অনেকটাই চাপা পড়ে গেলেও বাংলার পল্লীগ্রামের কৃষিজীবনে মাঠে লাঙল চালনার প্রথম দিনে, বীজ ছড়ানোর, শালিধান বোনার, ফসল কাটার বা ঘরের গোলায় তোলার আগে নানান ধরনের আচারানুষ্ঠান বাংলার বিভিন্ন জায়গায় হয়ত এখনো প্রচলিত আছে। এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই বিচিত্র শিল্পসুষমায় এবং জীবনের সুষম আনন্দে মণ্ডিত। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, তার কোনোটিতেই সাধারণত কোনো ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতের প্রয়োজন হতো না বা এখনো হয় না। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সবাই এসব পূজানুষ্ঠানের অধিকারী। নবান্ন উৎসব বা নতুন গাছের বা নতুন ঋতুর প্রথম ফল ও ফসলকে কেন্দ্র করে যেসব পূজানুষ্ঠান এখনো প্রচলিত, তার মূলেও একই চিত্তধর্মের একই বিশিষ্ট প্রকৃতি সক্রিয়।

বলা বাহুল্য, এসব আচারানুষ্ঠান শুধু কি কৃষিজীবনকে আশ্রয় করেই আবর্তিত? বাঙালির পল্লী শিল্পজীবনের যেখানে এখনো নগরায়ণের প্রভাব তীব্র হয়ে ওঠে নি, সেখানে দেখা গেছে বা এখনো দেখা যায়, বিশেষ বিশেষ দিনে কামারের হাঁপর, কুমোরের চাক, তাঁতীর তাঁত, চাষীর লাঙল, ছুতোর-রাজমিস্ত্রীর কারুযন্ত্র প্রভৃতিকে আশ্রয় করে এক ধরনের ধর্মকর্মানুষ্ঠান প্রচলিত। পরবর্তীকালে তারই কিছুটা আর্যীকৃত সংস্কৃতরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় বিশ্বকর্মাপূজার মধ্যে। কিন্তু মূলত এ ধরনের পূজাচারেও ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কোনো প্রয়োজন হয় না। উৎপাদন যন্ত্রের এই পূজাচারের সঙ্গে আদিবাসীদের প্রজননশক্তির পূজাচারের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এসব গ্রাম্য কৃষি ও কারুজীবনের পূজাচারকে কেন্দ্র করেই বাঙালির ধর্মকর্মময় জীবনের অনেক সৃষ্টির আনন্দ ও উদ্যোগ, শিল্পময়

জীবনের অনেক মাধুর্য ও সৌন্দর্য, এসব আচারানুষ্ঠানের অনেক আবহ ও উপচার আমাদের 'ভদ্র'স্তরের আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গেছে। যেমন–

"অনেকে নিশ্চয়ই জানেন, বাঙলার পাড়াগাঁয়ে সর্বত্রই গ্রামের বাহিরে জনপদসীমার বাহিরে 'থান' বা 'স্থান' বলিয়া একটা জায়গা নির্দিষ্ট থাকে; কোথাও কোথাও এই 'থান' উন্মুক্ত আকাশের নীচে বা গাছের ছায়ায়; কোথাও কোথাও গ্রামবাসীরা তাহার উপর একটা আচ্ছাদনও দেয়। এই 'থান' বা স্থানে– সংস্কৃতরূপে দেবস্থানে বা দেওথানে– মূর্তিরূপী কোনও দেবতা অধিষ্ঠিত কোথাও থাকেন, কোথাও থাকেন না, কিন্তু থাকুন বা না-ই থাকুন, সর্বত্রই তিনি পশু ও পক্ষী বলি গ্রহণ করিয়া থাকেন। গ্রামবাসীরা তাহার নামে 'মানৎ' করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ভয়ভক্তি করেন, এবং যথারীতি তাঁহাকে তুষ্ট রাখার চেষ্টাও করেন সকলেই, কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, গ্রামের ভিতর বা লোকালয়ে তাঁহার কোনও স্থান নাই। 'গ্রাম-দেবতা' সর্বত্র একই নামে বা একই রূপে পরিচিত নহেন; সাম্প্রতিক বাঙলায় কোথাও তিনি কালী, কোথাও ভৈরব বা ভৈরবী, কোথাও বনদুর্গা বা চণ্ডী, কোথাও বা অন্য কোনও স্থানীয় নামে পরিচিত। কিন্তু যে নামেই পরিচিত তিনি হউন, পুরুষ বা প্রকৃতি-তন্ত্রেরই হউন, সংশয় নাই যে, সর্বত্রই তিনি প্রাক্-আর্য আদিম জনগোষ্ঠীর ভয়-ভক্তির দেবতা। আদিবাসীদের এই সব গ্রাম্য দেবতাদের প্রতি আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি খুব শ্রদ্ধিতচিত্ত ছিল না। ব্রাহ্মণ্য বিধানে গ্রাম্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ; মনু তো বারবার এই সব দেবতার পূজারীদের পতিতই বলিয়াছেন। কিন্তু কোনও বিধান, কোনও বিধিনিষেধই ইঁহাদের পূজা ঠেকাইয়া রাখিতে আজও পারে না, আগেও পারে নাই। ইঁহাদের কেহ কেহ ক্রমশ ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মেকর্মে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন, এমনও বিচিত্র নয়। শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানাপ্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডমালিনী শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এইভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মকর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; দুই চারি ক্ষেত্রে তাহাদের কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়।" (অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, পৃষ্ঠা-৪৮১)

বলা বাহুল্য, গ্রামে যে গ্রামবাসীদের নিজের দেবতা থাকত, তার প্রাচীনত্ব নিয়ে সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থেও গ্রামবাসীদের নিজের দেবতারূপে গ্রাম্য দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়; যেমন, অর্থশাস্ত্রের তৃতীয় অধিকরণের দশম অধ্যায়ে পশুপ্রচার-দেশ-সংরক্ষণ-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে একপর্যায়ে কৌটিল্য বলছেন–

> গ্রামদেব-বৃষা বা অনির্দশাহা বা ধেনুরুক্ষাণো গোবৃষাশ্চাদণ্ড্যাঃ। (অর্থশাস্ত্র-৩/১০/৬)

অর্থাৎ, গ্রামদেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বৃষ বা দশদিন অতিক্রান্ত হয় নি এমন প্রসূতা গাভী, বৃদ্ধ বৃষভ এবং গোবৃষভ (প্রজননের জন্য নির্দিষ্ট ষাঁড়) উপরিউক্ত অপরাধ (অন্যের ক্ষেতে গিয়ে শস্য ভক্ষণ) করলে মালিকের কোনও দণ্ড হবে না।

অর্থশাস্ত্রে উল্লেখকৃত সেই-সব গ্রাম্য দেবতার সম্পত্তি গ্রামের বিশিষ্ট লোকেদের দ্বারা পরিচালিত হতো। সে সময় কিছু প্রাণীর, যেমন ব্যাঘ্র, সর্প, ইঁদুর, কুম্ভীর প্রভৃতির পূজা এবং তিথিবিশেষে উপদেবতার পূজাও প্রচলিত ছিল। সাধারণ লোকেদের নানা প্রকার সংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্তী হওয়ার জন্য দৈবশক্তি, ভোজবাজী ও মন্ত্রতন্ত্রে তাদের বিশ্বাসের অবধি ছিল না। দেবতার কোপই মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও সংক্রামক ব্যাধির হেতু বলে লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এসব ইঙ্গিত অর্থশাস্ত্রে বিরল নয়। রাজসরকার সিদ্ধতাপস এবং অথর্ববেদজ্ঞ পুরোহিতগণকে আপদ দূরীকরণের জন্য নিযুক্ত করতেন।

এখানে উল্লেখ্য, গ্রামের উপান্তে বসতির বাইরে যেসব জায়গায় এসব পূজানুষ্ঠান হতো এবং এখনো হয়, সেসব পূজাস্থানকে আশ্রয় করে বাংলার নানা জায়গায় নানা তীর্থস্থান গড়ে উঠেছে। এ ধরনের গাছ বা অন্যান্য গ্রাম্য লৌকিক দেবদেবীর পূজার কিছু কিছু বিবরণ বাঙালির প্রাচীনতম সাহিত্যে বিবৃত হয়ে আছে; যেমন, বটগাছের পূজা সম্বন্ধে কবি গোবর্ধন-আচার্যের একটি শ্লেষাত্মক শ্লোক আছে এভাবে—

> ত্বয়ি কুগ্রাম বটদ্রুম বৈশ্রবণো বসতু বা লক্ষ্মৌঃ।
> পামরকুঠারপাতাৎ কাসরশিরসৈব তে রক্ষা॥

অর্থাৎ, হে কুগ্রামের বটগাছ, তোমার মধ্যে বৈশ্রবণের (কুবের) অথবা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান থাকুক বা না থাকুক, মূর্খ গ্রাম্য লোকের কুঠারাঘাত হইতে তোমাকে রক্ষা করে শুধু মহিষের শৃঙ্গ তাড়না।

এ ছাড়া, অধ্যাপক নীহাররঞ্জনকৃত উদ্ধৃতিতে 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র একটি শ্লোকে গ্রাম্য লৌকিক দেবদেবীর পূজার একটি ভালো বিবরণ পাওয়া যায়—

> তৈস্তৈর্জীরোপহারৈগিরি কুহরশিলা সংশ্রয়ামর্চয়িত্বা
> দেবীং কান্তারদুর্গাং রুধিরমুপতরু ক্ষেত্রপালায় দত্ত্বা।
> তুম্বীবীণা বিনোদ ব্যবহৃত সরকামহ্নি জীর্ণে পুরাণীং
> হালাং মালুরকৌষের্যুবতি সহচরা বর্বরাঃ শীলয়ন্তি॥

অর্থাৎ, বর্বর (গ্রাম্যলোকেরা) নানা জীববলি দিয়া পাথরের পূজা করে, রক্ত দিয়া কান্তারদুর্গার পূজা করে, গাছতলায় ক্ষেত্রপালের পূজা করে এবং দিনের শেষে তাহাদের যুবতী সহচরীদের লইয়া তুম্বীবীণা বাজাইয়া নাচগান করিতে করিতে বেলের খোলায় মদ্যপান করিয়া আনন্দে মত্ত হয়।

তবে বাঙালির ধর্মজীবনে একটি উল্লেখযোগ্য বড় স্থান অধিকার করে আছে বিভিন্ন প্রকারের ব্রতোৎসব। এই ব্রতোৎসবের ইতিহাস অতি জটিল ও সুপ্রাচীন এবং এ ধরনের ধর্মোৎসব যে প্রাক্-বৈদিক আদিবাসী কোমদের সময় থেকেই সুপ্রচলিত ছিল এ-সম্বন্ধে পণ্ডিতজনেরা অনেকটাই নিঃসংশয় বলে মনে হয়। তাঁদের মতে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যাঁদেরকে 'ব্রাত্য' বা 'পতিত' বলত তাঁরা হয়ত ব্রতধর্ম পালন করতেন বলেই উল্লিখিত নামে অভিহিত হয়েছেন। এবং সেজন্যেই

হয়ত আর্যরা তাঁদেরকে পতিত বলে গণ্য করতেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় কৃত প্রাসঙ্গিক টীকাটি প্রণিধানযোগ্য–

"ব্রতের সঙ্গে ব্রাত্যদের সম্বন্ধ কোনো অকাট্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। তবে, এই অনুমান একেবারে অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক নাও হইতে পারে। ঋগ্বেদীয় আর্যরা ছিলেন যজ্ঞধর্মী; যজ্ঞধর্মী আর্যদের বাহিরে যাঁহারা ব্রতধর্ম পালন করিতেন, ব্রতের গুহ্য যাদুশক্তি বা ম্যাজিকে বিশ্বাস করিতেন তাঁহারাই হয়তো ছিলেন ব্রাত্য। এই ব্রাত্যরা যে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে জড়িত তাহা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য এবং ইহাও লক্ষণীয় যে, ব্রতধর্মের প্রসার বিহার, বাঙলা, আসাম এবং উড়িষ্যাতেই সবচেয়ে বেশি। ব্রতকথাটির বুৎপত্তিগত অর্থ-ই বোধ হয় (বৃ-ধাতু+ক্ত) আবৃত করা, সীমা টানিয়া পৃথক করা। নির্বাচন করাই ব্রতের উদ্দেশ্য; বরণ কথাটিরও একই ব্যঞ্জনা। ব্রতানুষ্ঠানে আল্পনা দিয়া অথবা বৃত্তাকারে সীমা রেখা টানিয়া ব্রতস্থান চিহ্নিত করিয়া লওয়া হয়; এই সীমা রেখা টানা স্থান নির্বাচন বা চিহ্নিত করার মধ্যে যাদুশক্তির বা ম্যাজিকের বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন। আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে বরণ করার যে স্ত্রী-আচার প্রচলিত– যেমন নূতন বরের দুই বাহুতে, বুকে কপালে ঠেকানো ও সঙ্গে সঙ্গে বরণের ছড়া উচ্চারণ– তাহার ভিতরেও ম্যাজিকেরই অবশেষ আজও লুক্কায়িত। এই বরণের অর্থও অশুভ শক্তির প্রভাব হইতে পৃথক করা, আবৃত করা, নির্বাচন করা। ব্রত এবং বরণের স্ত্রী-আচারগুলি লক্ষ্য করিলেই ইহাদের, সমগোত্রীয়তা ধরা পড়িয়া যায় এবং গোড়ায় যে ইহাদের সঙ্গে ম্যাজিকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল তাহাও পরিষ্কার হইয়া যায়। ব্রত এবং বরণ উভয় অনুষ্ঠানেই শুধু মেয়েদেরই যে অধিকার এ তথ্যও লক্ষণীয়। এই ম্যাজিক-বিশ্বাসী ব্রতচারী লোকেরাই ঋগ্বেদীয় আর্যদের চোখে বোধ হয় ছিলেন ব্রাত্য!" (নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, পৃষ্ঠা-৪৮৪)

বলাই বাহুল্য, অতীত যুগের মানুষদের জীবনচর্যায় নিহিত অন্যতম মৌল অনুষঙ্গ হিসেবে প্রজননশক্তির সাথে এই ম্যাজিক বা উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাসের কল্পিত সংশ্লিষ্টতা শাক্তধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় তা নিয়ে অধিকতর পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য হবে না যে, আমাদের গ্রাম্য-সমাজে বিশেষভাবে নারীদের মধ্যে যেসব ব্রত এখনো প্রচলিত আছে তার অধিকাংশই অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য। এগুলি মূলত গুহ্যজাদু ও প্রজননশক্তির পূজা, যে পূজা গ্রাম্য কৃষিসমাজের সঙ্গে একান্ত সম্পৃক্ত। ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে প্রাচীন বৈদিক ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসূত্র কোথাও কোনো প্রচলিত ব্রতের কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নেই। কিন্তু পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুরাণ যখন সংকলিত হচ্ছিল তখন বা তার কিছুকাল আগে থেকে মনে হয় ব্রতানুষ্ঠানের প্রতি আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মনোভাবের পরিবর্তন হচ্ছিল। কারণ এসব পুরাণে দেখা যায় লৌকিক অনেক ব্রতানুষ্ঠান ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুমোদন লাভ করে ওই ধর্মের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে এবং ব্রাহ্মণেরা সেসব অবৈদিক, অস্মার্ত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্যও করছেন। সন্দেহ নেই, প্রাক্-আর্য ও অনার্য নরনারীরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সীমায় গৃহীত হওয়ার ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশে আদি ও মধ্যযুগ জুড়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু অবৈদিক, অস্মার্ত,

অপৌরাণিক ব্রতানুষ্ঠান এভাবে ক্রমশ ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, যেসব ব্রত এ ধরনের স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করেছে সেসব অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয়, আর যেসব স্বীকৃত হয় নি সেসব ক্ষেত্রে কোনো পুরোহিতেরই প্রয়োজন হয় না– গৃহস্থ মেয়েরাই সেসব ব্রত-পূজা নিষ্পন্ন করে থাকেন। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের স্বীকৃত-সীমার বাইরে সারা বছরব্যাপী গ্রাম্যসমাজে প্রচলিত মাসভিত্তিক অনুষ্ঠিত এরকম কিছু ব্রতের নাম নিম্নোক্তভাবে তালিকাবদ্ধ করেছেন–

বৈশাখে– পুণ্যপুকুর ব্রত (বারি বর্ষণের জন্য গুহ্য জাদুশক্তির পূজা), শিবপূজা ব্রত (প্রজননশক্তির পূজা), চম্পা-চন্দনা ব্রত (প্রজননশক্তির পূজা), পৃথ্বীপূজা ব্রত (প্রজননশক্তির এবং গুহ্য জাদুশক্তির পূজা), গোকাল ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজননশক্তির পূজা), অশ্বত্থপট ব্রত (ঐ), হরিচরণ ব্রত (গুহ্য জাদুশক্তির পূজা), মধুসংক্রান্তি ব্রত (ঐ), গুপ্তধন ব্রত (ঐ), ধানগোছানো ব্রত (ঐ), যাচা পান ব্রত (ঐ), তেজোদর্পণ ব্রত (ঐ), রণে এয়ো ব্রত (ঐ), দশ পুতুলের ব্রত (ঐ), সন্ধ্যামণি ব্রত (ঐ), থোয়াথুয়ি ব্রত (ঐ), বসুন্ধরা ব্রত (বারি বর্ষণের জন্য প্রজননশক্তির পূজা)।

জ্যৈষ্ঠে– জয়মঙ্গলের ব্রত (প্রজননশক্তির পূজা)।

ভাদ্রে– ভাদুরি ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত গুহ্য জাদুশক্তির পূজা), তিলকুজারি ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা)।

কার্তিকে– কুলকুলটি ব্রত (গুহ্য জাদুশক্তির পূজা), ইতুপূজা ব্রত (প্রজননশক্তির পূজা)।

অগ্রহায়ণে– যমপুকুর ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজননশক্তির পূজা), সেঁজুতি ব্রত (গুহ্য জাদুশক্তির পূজা), তুষতুষলি ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজননশক্তির পূজা)।

মাঘে– তারণ ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজননশক্তির পূজা), মাঘমণ্ডল ব্রত (ঐ)।

ফাল্গুনে– ইতুকুমার ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজননশক্তির পূজা), বসন্ত রায় ও উত্তম ঠাকুর ব্রত (ঐ), সসপাতা ব্রত (ঐ)।

চৈত্রে– নখছুটের ব্রত (গুহ্য জাদুশক্তির পূজা)।

এগুলি ছাড়াও বাঙালির আরো অনেক মেয়েলি ব্রত আছে, যা মূলত গুহ্য জাদুশক্তি ও প্রজননশক্তির পূজারূপে আদিবাসী কোমদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তেমন অনেক ব্রত ইতোমধ্যেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে আমাদের শুভকর্ম পঞ্জিকাতেও স্থান পেয়ে গেছে; যেমন ষষ্ঠী ব্রত, মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, সুবচনী ব্রত ইত্যাদি। এ ছাড়াও রয়েছে অম্বুবাচীর পারণ, মনসাদেবীর পূজা ইত্যাদি নারীপ্রধান বহু লৌকিক ধর্ম ও কর্মানুষ্ঠান।

বাঙালির ভাবজগতে মাতৃপ্রাধান্য

বেদ-পূর্ব সিন্ধু-ধর্ম মাতৃপ্রধান এবং বৈদিক ধর্ম যে পুরুষ-প্রধান, এ বিষয়ে বিদ্বান-পণ্ডিতদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায় অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো, পরবর্তীকালের ভারতবর্ষীয় ধর্মে অন্তত সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঋগ্বেদের প্রাচীন পুরুষ-দেবতাদের বিশেষ কোনো পরিচয়ই পাওয়া যায় না। অন্যদিকে উত্তরকালের এই ধর্মবিশ্বাসের প্রধানতম উপাদান হলো মাতৃপূজা– তা যে ওই বেদ-পূর্ব সিন্ধু-ধর্মেরই রেশ, সে কি আর বলার অপেক্ষা রাখে?

এটাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানবসভ্যতায় দেবীপূজার ইতিহাসও অতি প্রাচীন। পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিগুলির মধ্যেও প্রাচীনকালে দেবীপূজার প্রচলন ছিল। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, ভূমধ্যসাগরের তীরে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে মাতৃদেবীর পূজার সর্বব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সব প্রত্ন-উপাদান পাওয়া গেছে, তা থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, প্রাক্-আর্যযুগে ভারতবর্ষে মাতৃদেবীর পূজার ব্যাপক প্রসার ছিল। মূর্তিতে মাতৃপূজা কেবল সিন্ধুযুগেই প্রচলিত ছিল না, কৃষ্ণসাগরের তীরে এবং দানিয়ুব উপত্যকাতেও একইভাবে মূর্তির মাধ্যমে মাতৃদেবীর পূজা হতো। অধ্যাপক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে–

"পণ্ডিতদের মতে হিন্দুদের শক্তি উপাসনা এসেছে অনার্যদের কাছ থেকে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে শক্তি বা মাতৃকা উপাসনা প্রস্তর যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। ইয়োরোপে সুপ্রাচীন যুগে (Paleolithic and Neolithic ages) ভেনাসের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। দুইটি সন্তান ও স্বামীসহ মাতৃকামূর্তির আবিষ্কারও ঐ যুগে শক্তিপূজার প্রমাণ দেয়। সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, প্যালেষ্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীট্ ও মিশরে মাতৃকা মূর্তি পাওয়া গেছে। মার্শাল সাহেবের মতে নীলনদ থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ মাতৃকা পূজার ক্ষেত্র ছিল।" (হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় পর্ব, পৃষ্ঠা-১৬০)

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থের নিবেদনে বলেছেন– "মাতৃপূজার প্রচলন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কালে নানারূপে দেখা যায়, এখনও হয়ত স্থানে স্থানে কিছু কিছু অবশেষ রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহার কোথাওই ভারতবর্ষের অনুরূপ শক্তিবাদ বা শক্তিসাধনা গড়িয়া উঠিতে দেখি না। শক্তিবাদ এমন করিয়া আমাদের ভারতীয় চিন্তাধারার একটি বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক বলিয়া এবং আমাদের জীবনের উপর এমন করিয়াই ইহার একটি সামগ্রিক প্রভাব বলিয়া ইহা বিশেষ করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।...

শাক্ত ধর্মমত ও সাধনা নানাভাবে এখনও ভারতবর্ষের প্রায় সব অঞ্চলেই অল্পবিস্তর দেখা যায় বটে, কিন্তু যেটুকু তথ্য আমার অধিগত হইয়াছে তাহাতে মনে হইয়াছে, এই সাধনা বাঙলাদেশে যেরূপ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন অন্যত্র কোথাও নহে; এবং প্রকারে ও পরিমাণে বাঙলাদেশে যে শাক্ত সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাও অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না।"

অন্যদিকে আমরা দেখি যে– "বৃক্ষ প্রতীকে দেবীপূজাও অনার্য গোষ্ঠীর মধ্যে অনেক কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। বাংলা এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গ্রামে দেবীরা এখনো বৃক্ষে বসবাস করেন বলেই বিশ্বাস। বিভিন্ন গ্রামের দেবীস্থানগুলি বিশেষ বিশেষ বৃক্ষতলেই অবস্থিত। ওইসব দেবীস্থানে যেসব গাছকে দেবীজ্ঞানে বা দেবীর আবাস হিসাবে শ্রদ্ধা করা হয়, সেগুলির সর্বদাই যে শাস্ত্রীয় মর্যাদা আছে তাও নয়। মনসা গাছে দেবী মনসার পূজা বাংলার সর্বত্র প্রচলিত। বিল্ববৃক্ষকে দেবীর বাসস্থান হিসাবে শাস্ত্রকাররা উল্লেখ করেছেন। দুর্গাপূজার সময় যে নবপত্রিকা পূজিতা হন, তার মধ্যেও বৃক্ষরূপিনী দেবীর পূজার সুষ্ঠু প্রমাণ আছে।" (ড. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গামাহাত্ম্য ও পূজাপ্রসঙ্গ)

নবপত্রিকা বলতে নয়টি গাছকে বোঝানো হয়। একটি সপত্র কলাগাছের সঙ্গে বাকি আটটি সমূল সপত্র উদ্ভিদ অথবা সপত্র শাখা একত্র করে একজোড়া বেলসহ বেঁধে, শ্বেত অপরাজিতা লতার দ্বারা বেষ্টন করে লালপাড় সাদা শাড়ি জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বধূর আকার দিয়ে সিঁদুর মাখিয়ে এই নবপত্রিকা প্রস্তুত করা হয়। দুর্গাপূজায় গণেশের পাশে দেবীমূর্তির ডানদিকে এই নবপত্রিকা স্থাপনের বিধি দুর্গাপূজা পদ্ধতিগুলিতে লক্ষ করা যায়। এজন্যেই হয়ত কেউ কেউ ভুল করে নবপত্রিকাকে গণেশের বৌ বলে থাকেন। নবপত্রিকার নয়টি গাছের নাম হলো– কলা, ডালিম, ধান, হলুদ, মানকচু, সাধারণ কচু, বেল, অশোক ও জয়ন্তী। নব্য স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য রচিত 'তিথিতত্ত্বে'র একটি শ্লোকে এই নবপত্রিকার পরিচয় দেওয়া হয়েছে–

কদলী দাড়িমী ধান্যং হরিদ্রা মানকং কচুঃ।
বিল্বাশোকৌ জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকা॥

তবে নবপত্রিকা নবদুর্গা নামে পূজিতা হন– উদ্ভিদগুলি দেবীর প্রতিরূপ হিসেবে গণ্য হয়। এই নয় দেবী হলেন– রম্ভাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, দাড়িম্বাধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকা, ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী, হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রী উমা, মানাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডা, কচ্বাধিষ্ঠাত্রী কালিকা, বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবা, অশোকাধিষ্ঠাত্রী শোকরহিতা ও জয়ন্তাধিষ্ঠাত্রী কার্তিকী। নয়টি উদ্ভিদের একত্র অবস্থান নবপত্রিকা নবদুর্গা নামে 'নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে পূজিতা হয়। নবপত্রিকা সম্পর্কে পণ্ডিতেরা প্রায় সমস্বরে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে নবপত্রিকা শস্যদেবীর পূজা। শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তের ভাষ্য অনুযায়ী–

"এই শস্যবধূকেই দেবীর প্রতীক গ্রহণ করিয়া প্রথমে পূজা করিতে হয়, তাহার কারণ শারদীয়া পূজা মূলে বোধহয় এই শস্য-দেবীরই পূজা। পরবর্তীকালের বিভিন্ন দুর্গাপূজার বিধিতে এই নবপত্রিকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।...বলা বাহুল্য এই সবই হইল পৌরাণিক দুর্গাদেবীর সহিত এই শস্যদেবীকে সর্বাংশে মিলাইয়া লইবার একটা সচেতন চেষ্টা। এই শস্য-দেবী মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ, সুতরাং আমাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের দুর্গাপূজার ভিতরে এখনও এই আদিমাতা পৃথিবীর পূজা অনেকখানি মিশিয়া আছে।" (ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃষ্ঠা-২৫-২৬)

শবর প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রচলিত শস্যোৎসব থেকে দুর্গাপূজার এই অঙ্গটি আসতে পারে বলে যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করেন– "বোধ হয় কোনও প্রদেশে শবরাদি জাতি নয়টি গাছের পাতা সম্মুখে রাখিয়া নবরাত্রি উৎসব করিত। তাহাদের নবপত্রী দুর্গা প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত হইতেছে। মানুষের স্বভাব– যেটা কোথাও হয়, সেটা অন্যত্র প্রচারিত হয়।" (পূজাপার্বণ)

শক্তিসাধনার দেবীসংক্রান্ত আলোচনায় বিভিন্ন বিদ্বান পণ্ডিতেরা প্রসঙ্গক্রমে এই নবপত্রিকার বিষয়টিকে তাঁদের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন বাংলার ধর্মসাধনা প্রসঙ্গে ড. অতুল সুর তাঁর 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন' গ্রন্থে বলেছেন–

"বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে বাঙলাদেশে আদিম অধিবাসীদের ধর্মই অনুসৃত হত। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি, মানুষ ও প্রকৃতির সৃজনশক্তিকে মাতৃরূপে পূজা, 'টোটেম'-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং গ্রাম, নদী, বৃক্ষ, অরণ্য, পর্বত ও ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, মানুষের ব্যাধি ও দুর্ঘটনাসমূহ দুষ্ট শক্তি বা ভূতপ্রেত দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস ও বিবিধ নিষেধাজ্ঞা-জ্ঞাপক অনুশাসন ইত্যাদি নিয়েই প্রাক্-আর্য ধর্ম গঠিত ছিল। কালের গতিতে এই সকল বিশ্বাস ও আরাধনা-পদ্ধতি ক্রমশ আর্যগণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল এবং সেগুলি হিন্দুধর্মের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। এই সকল সংস্কারই ক্রমশ হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মে পরিণত হয়। বস্তুত ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনেক কিছু পূজাপার্বণের অনুষ্ঠান যেমন– দুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট নবপত্রিকার পূজা ও শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, চড়ক, গাজন প্রভৃতি এবং আনুষ্ঠানিক কর্মে চাউল, কলা, কলাগাছ, নারিকেল, সুপারি, পান, সিঁদুর, ঘট, আলপনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোময় ও পঞ্চগব্যের ব্যবহার ইত্যাদি সবই আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে আরও গৃহীত হয়েছিল আটকৌড়ে, সুবচনীপূজা, শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠীপূজা, বিবাহে গাত্রহরিদ্রা, পানখিলি, গুটিখেলা, স্ত্রী-আচার, লাজ বা খই ছড়ানো, দধিমঙ্গল, লক্ষ্মীপূজার সময় লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপন ইত্যাদি আচার যা বর্তমান কালেও বাঙালী হিন্দু পালন করে থাকে। এসবই প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির দান। এ ছাড়া নানারূপ গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা, ধ্বজাপূজা, বৃক্ষের পূজা, যাত্রাজাতীয় পর্বাদি, যেমন স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি এবং ধর্মঠাকুর, মনসা, শীতলা, জাঙ্গুলি, পর্ণশবরী, প্রভৃতির পূজা ও অম্বুবাচী অরন্ধন, পৌষপার্বণ, নবান্ন ইত্যাদি সমস্তই আমাদের প্রাক্-আর্য-জাতিসমূহের কাছ থেকে গৃহীত।" (বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন)

অতএব, পরিশেষে আমরা বলতে পারি, শাক্ত-তান্ত্রিক ভাবধারার সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে সর্বোচ্চ দেবতা একজন নারী, যিনি নানা নামে ও রূপে কল্পিতা। শাক্ত পুরাণসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী স্বয়ং আদ্যাশক্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের প্রতীকস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করেন। এই আদ্যাশক্তি বা শক্তিতত্ত্বের মূল সুপ্রাচীন যুগের মানুষের জীবনচর্যার মধ্যে নিহিত। আদিম চেতনায় নারী শুধু উৎপাদনের প্রতীকই নয়, সত্যকারের জীবনদায়িনীর ভূমিকাও তারই। সামাজিক বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরগুলিতে তাই এই মাতৃত্বের ভূমিকাই ছিল প্রধান,

জীবনদায়িনী মাতৃদেবীই ছিলেন ধর্মজীবনের কেন্দ্রবিন্দু। এই নারীশক্তির সঙ্গে পৃথিবীর, মানবীয় ফলপ্রসূতার সঙ্গে প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার, সমীকরণ সাংখ্য ও তন্ত্রোক্ত প্রকৃতির ধারণার উদ্ভবের হেতু, যা থেকে পরবর্তীকালের শক্তিতত্ত্বের বিকাশ ঘটে। পৃথিবীর সর্বত্রই আদিম কৃষিজীবী কৌমসমাজে ধরণীর ফলোৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে নারীজাতির সন্তান-উৎপাদিকা শক্তিকে অভিন্ন করে দেখার রীতি বর্তমান। সংস্পর্শ বা অনুকরণের দ্বারা একের প্রভাব অন্যের উপর সঞ্চারিত করা সম্ভব, এই বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই আদি-তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতির রহস্য মানবদেহেরই রহস্য, কারণ মানবদেহই বিশ্বপ্রকৃতির সংক্ষিপ্তসার।

যেহেতু প্রকৃতি সর্বত্র নারীরূপেই কল্পিত, অতএব দেবী সনাতনী আদ্যাশক্তিও মাতৃরূপেই কল্পিত হয়েছে, যা বাঙালির ভাবজগৎকে প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। কাল ও সময়ের প্রেক্ষাপটে হাজার বছরের পরম্পরায় বাঙালির সামাজিক আচার ও ধর্মাচরণে যতই ভিন্নমাত্রিক সংস্কৃতি ও ধর্মচিন্তার আমদানি ঘটুক না কেন, তার গভীর অন্তর্বর্তিকায় এখনো বেজে যায় পরম্পরাগত মাতৃকাশক্তি তথা নারী-প্রাধান্যের ফল্গু সঙ্গীত।

রণদীপম বসু লেখক। ranadipam@gmail.com

ঋণস্বীকার

১. ভারতীয় দর্শন : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০০৭, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

২. লোকায়ত দর্শন : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৩. মনুসংহিতা : সম্পাদনা ও অনুবাদ ড. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, সুলভ সংস্করণ ১৪১২ বঙ্গাব্দ, স্বদেশ, কলকাতা।

৪. কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্ (কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র) : সম্পাদনা ড. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ ২০১০, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

৫. বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব : নীহাররঞ্জন রায়, সপ্তম সংস্করণ ফাল্গুন ১৪১৬ বাংলা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৬. ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস : নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, তৃতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৪, জেনারেল, কলকাতা।

৭. মাতৃকাশক্তি : অশোক রায়, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৮. ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য : শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, অষ্টম মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৬, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

৯. ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : ড. অতুল সুর, চতুর্থ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪২১ নভেম্বর ২০১৪, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

১০. বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন : ড. অতুল সুর, চতুর্থ সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪১৯ এপ্রিল ২০১২, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

১১. গোল্ডেন বাউ : মানুষের জাদুবিশ্বাস ও ধর্মাচার বৃত্তান্ত : স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার : অনুবাদ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, পরিমার্জিত শোভন সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, বিপিএল, ঢাকা।

১২. হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান : চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, প্যাপিরাস পরিবর্ধিত সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৪, প্যাপিরাস, কলকাতা।

১৩. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম যৌথ প্রকাশ মে ২০১৫, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ এবং সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা।

১৪. হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (তৃতীয়পর্ব) : হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৬, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

১৫. চার্বাকের খোঁজে ভারতীয় দর্শন : রণদীপম বসু, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, রোদেলা সংস্করণ, ঢাকা।